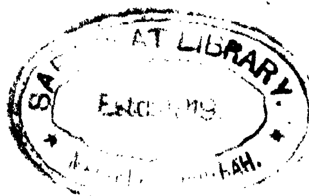
সুভাষচন্দ্রের

অন্তর্দ্ধান-কাহিনী



উত্তমচাঁদ

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ—১৩৫৩
মূল্য ঃ দুই টাকা চার আনা

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা

যাঁহার প্রেরণা

ও

সাহায্য ব্যতীত

বোসবাবু ও মাতৃভূমির

সেবা করা আমার দ্বারা সম্ভবপর হইত না

আমার সেই

সহধর্ম্মিণী

শ্রীমতী রামো দেবীকে

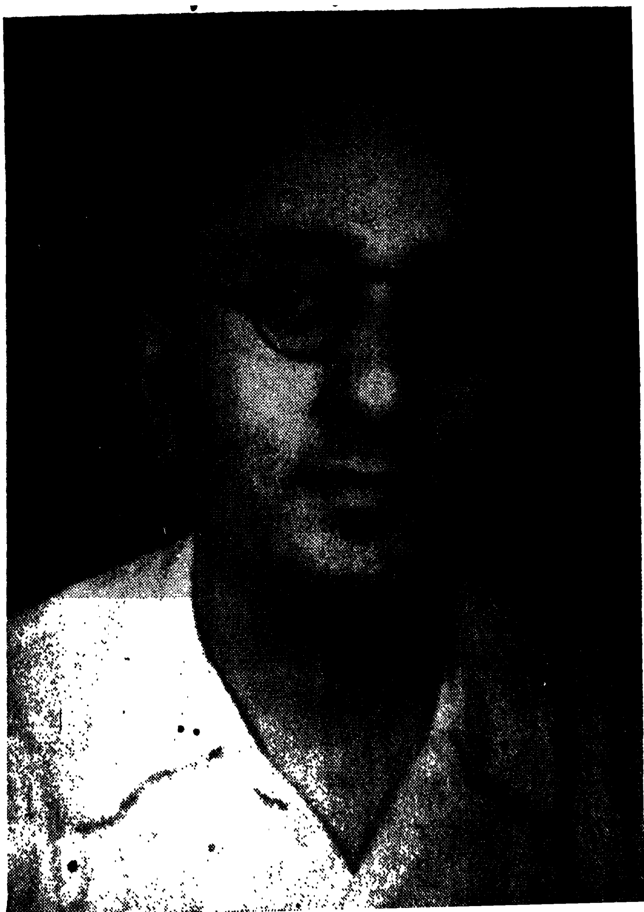
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম

প্রকাশকের নিবেদন

উত্তমচাঁদ বর্ণিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এই বিস্ময়কর কাহিনী সাধারণ্যে প্রকাশ করার গৌরব সর্ব্বপ্রথম দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস্' অর্জ্জন করেন। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর, ভারতের নানা ভাষার নানা পত্রিকায় ও গ্রন্থে এই কাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে। কলিকাতার দৈনিক 'ভারত' পত্রিকায় যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়, উক্ত অনুবাদই আমরা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলাম। এই গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারে 'ভারতে'র প্রধান কর্ণধার শ্রীমাখনলাল সেন, সুসাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। বিশেষ তৎপরতা সহকারে কাগজ সরবরাহ করে ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোং লিঃ ও রঘুনাথ দত্ত অ্যাণ্ড সন্স আমাদের সহযোগিতা করায় আমরা এই প্রসঙ্গে তাঁদের কথাও স্মরণ করছি।

এই গ্রন্থের নিজস্ব লভ্যাংশ থেকে উত্তমচাঁদ সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গফুর খান প্রতিষ্ঠিত খোদাই খিদ্‌মদ্‌গার সমিতি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য-ভাণ্ডারে কিছু অংশ দেবেন বলে স্থির করেছেন।

প্রকাশক



উত্তমচাঁদ

কয়েকটি কথা

অনেকেই এ কথা জেনে আশ্চর্য্যান্বিত হবেন যে সুভাষচন্দ্র বসু হিন্দুস্থান থেকে কাবুলের পথ দিয়ে বার্লিন গিয়েছিলেন। কাবুলে তিনি আমার বাড়ী 'হিন্দু গুজ্জার'-এ বাস করেছিলেন। যখন তিনি বার্লিনের পথে যাত্রা করেন, তখন আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম যে, বার্লিন বা মস্কো গিয়ে তিনি যেন নিজে ভারতবর্ষ থেকে নিরুদ্দেশ হবার সম্পূর্ণ কাহিনী একটি পুস্তকাকারে লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। এর উত্তরে তিনি ঐ সময় বলেছিলেন, যদি লেখবার সময় পাই, অবশ্যই লিখে পাঠাব। কিন্তু আমি যতদিন কারারুদ্ধ ছিলাম, ততদিন তাঁর কোন জিনিসই আমার কাছে এসে পৌঁছায় নি।

আমি পেশোয়ারের বাসিন্দা। জন্ম আমার এক উচ্চ বংশেই হয়েছিল, এবং ছেলেবেলা থেকে বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু ছিল। সেই সময় থেকেই আমি ভাবতাম, যে, পৃথিবীতে অর্থের বণ্টন কত অন্যায় ভাবেই না হয়েছে। একদিকে কত লোক এমন গরীব যে দিনভোর পরিশ্রম করেও নিজেরা ও নিজেদের ছেলেমেয়েদের পেট ভরে খাওয়াতে পাচ্ছে না; আর একদিকে এমন বড়লোক আছে, যাদের ঐশ্বর্য্য ঝলমল করছে আর আরামের জিনিস সব সময় রয়েছে চোখের সামনে। সব ধর্ম্মাবলম্বীদের ভেতরেই এই ধারণা আছে যে, ধন ঐশ্বর্য্যের বিভাগ পরমাত্মাই করে থাকেন। পরমাত্মা যার ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন, সেই টুকুই সে পায়, তার চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু এটা আমার বুদ্ধিতে কিছুতেই আসত না যে, ঈশ্বর এই

অন্যায় বণ্টন করেন কি করে। আমার শিক্ষা খুব বেশি ছিল না, সে জন্য এ বিষয় বেশি ভাবতেও পারতাম না।

১৯২৮-২৯ সালে পেশোয়ারে কংগ্রেসের একটি শাখা স্থাপিত হয়। সেই উদ্বোধন-উৎসবে আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কংগ্রেসের ঘোষণাপত্র পড়ে জানলাম যে, ভারতবর্ষ গরীব হবার প্রধান কারণ আমাদের পরাধীনতা। যদি আমাদের এই পরাধীনতা দূরীভূত হয়, তাহলে আবার আমরা আমাদের আসল স্বচ্ছল অবস্থায় ফিরে আসতে পারব। আমার উপর এর অত্যন্ত প্রভাব হয়, এবং আমি কংগ্রেসের চার আনাওয়ালা সদস্য হয়ে যাই।

এর কিছুদিন পরে পেশোয়ারে 'নওজোয়ান ভারত সভা' নামে আর একটি সমিতি গঠিত হ'ল। তাদের ঘোষণাপত্রেও জানা গেল যে, ধন-রত্নের অন্যায় বিভাগের দরুণই বর্ত্তমানে আমাদের এই অবস্থা। আর তার পরিবর্ত্তন হলেই আমাদের সকল কষ্টের অবসান হবে। 'নওজোয়ান ভারত সভা'র সম্পাদককে প্রশ্ন করে জানলাম যে, কংগ্রেসের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমি এই সংসদের মেম্বর হতে পারি। এই সংসদের সদস্যরা সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন। আমিও এর সদস্য হয়ে গেলাম। আমার বয়স তখন আঠারোর কাছাকাছি এবং আমার দ্বারা দেশ সেবার সেইটাই ছিল প্রকৃষ্ট সময়।

১৯৩০ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন, তখন আমাদের প্রদেশের বহু নেতা কারারুদ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে আমাদের সভার সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তার হবার পর সভ্যরা আমাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন।

নেতাদের গ্রেপ্তারের পর জনসাধারণ অত্যন্ত অশান্ত হয়ে পড়ল। কিছুদিন পরে কংগ্রেসের আরও দু'তিন জন নেতা গ্রেপ্তার হলেন।

যখন পুলিশ তাঁদের থানায় নিয়ে যেতে লাগল, তখন জনসাধারণ দারুণ সমারোহে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলে। এই ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল, এবং পুলিশরা বিক্ষোভকারীদের উপর গুলী চালালো। সে সময় কতই না দেশসেবক স্বাধীনতার বেদীর উপর নিজেকে বলিদান দিলেন। যে স্থানে দেশসেবকেরা স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করেছিলেন, সে স্থানে এখনও প্রত্যেক বছর মেলা বসে।

এই ঘটনার পর পেশোয়ারে যথেষ্ট ধরপাকড় হ'ল। আমিও ধরা পড়লাম। কংগ্রেস এবং 'নওজোয়ান ভারত সভা' দুই-ই বেআইনী ঘোষণা করা হ'ল। দু'মাস পরে আমাদের বিচার আরম্ভ হ'ল এবং আমার উপর দু'বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হ'ল।

প্রধানতঃ আমাদের ব্যবসা আফগানিস্থানের লোকেদের সঙ্গে ছিল। কারাবাসের পূর্ব্বে আমি কাবুল যাবার ছাড়পত্র নিয়েছিলাম। জেল থেকে বেরোবার পরই আমি আফগানিস্থানের ছাড়পত্র নিয়ে কাবুলে চলে গেলাম। সেখানে পৌছবার সাত মাস পরে আমার কাকা ও ভায়ের সঙ্গে কাবুলে দোকান খোলা সম্বন্ধে সলা-পরামর্শ করার জন্যে আবার আমায় পেশোয়ারে আসতে হ'ল। দ্বিতীয়বার কাবুল যাবার সময় সি; আই, ডি-রা অনেক কষ্টে আমায় পাশপোর্ট দিলে। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত আমি সেখানে গিয়ে পৌছলাম। আমার কাকা ১৯৩২ সালে আফগান সরকার থেকে দোকান খোলার অনুমতি পেলেন। নতুন ভারতীয়দের নিজের নামে কারবার করা নিষিদ্ধ ছিল। সে জন্য আমি নিজের নামে কারবার করার অনুমতি পেলাম না। ১৯৩৮-৩৯ সালে আফগান সরকার ভারতবাসীদের কিছু বিশেষ সর্ত্ত অনুযায়ী ব্যবসা করার অনুমতি

দিতে লাগলেন। কিন্তু সর্ত্তগুলি অত্যন্ত কঠোর হওয়াতে, নতুন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করার সাহস করতেন না।

১৯৪২ সালের মে পর্য্যন্ত আমার কারবার চলতে লাগল। এ সময় আমি কখনও পেশোয়ারে আসতাম, আবার কখনও আমার ভাই ও কাকা কাবুলে আসতেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমিই কাবুলে থাকতাম।

বোসবাবু কাবুলে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে পৌঁছলেন। তাঁর কাবুল থেকে চলে যাবার এক বছর পরে একদিন আমি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে একখানি খবরের কাগজ পড়তে পড়তে একটি ছোট অক্ষরের ছাপা খবরের প্রতি আমার নজর পড়ে। খবরটি পড়ে জানলাম যে, একটি লোককে সরকার গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু মোটেই বুঝতে পারলাম না যে, তাঁর মত লোক গ্রেপ্তার হ'ল কি ভাবে! সেই সময়েই আমার ধারণা হ'ল যে আমার অবস্থা আর সুবিধের নয়। ১৯৪২ সালের ২৪শে মে আফ্‌গান সরকার থেকে আমি নোটিস পেলাম যে, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে আফ্‌গানিস্থানের সীমার বাইরে চলে যেতে হবে। আমি দরখাস্ত করলাম যে, দীর্ঘ বারো বছর ধরে এখানে আমি ব্যবসা করছি, আর আফ্‌গান সরকারকে লাখ লাখ টাকার উপর মাল-সরবরাহের কর দিই। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বেচা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এবং স্থানীয় লোকের কাছে যা পাওনাগণ্ডা আছে তাও আদায় করা সম্ভবপর নয়। আফ্‌গান সরকারের উপর আমার দরখাস্তের কোন প্রভাব হ'ল না। চল্লিশ ঘণ্টার ভেতরই আমাকে গ্রেপ্তার করে তারা ২৭শে মে তারিখে রাত্রি বারোটার সময় লরি ক'রে জালালাবাদে পাঠিয়ে দিলে। সেখানে সকালে আমাকে একটি ছোট অন্ধকার কক্ষে তারা বন্ধ করে রাখলে। দু'দিন আমি সেখানেই রইলাম। সে দু'দিন আমি

কিছুই খেতে পাইনি। ঐ কক্ষটি এমনই ছিল যে, কখন রাত্রি হচ্ছে আর কখন দিন হচ্ছে কিছুই ধরতে পারতাম না। পরে আমি নিজে ভেবে আশ্চর্য্য হতাম যে, কি ক'রে ঐ কুঠুরিটিতে আমি বেঁচে ছিলাম। যখন তারা আমায় বাইরে আনলে, তখন আমার মনে হ'ল যে আমাকে একটা কবরের ভেতর থেকে বার করা হ'ল। আমার যে জিনিসপত্র দোকানে ও বাড়ীতে ছিল, তার ভেতর থেকে কেবলমাত্র আমি একটি কম্বল নেবার অনুমতি পেয়েছিলাম। যখন ডাকায় গেলাম, সেই কম্বলটিও আবার পুলিশ নিয়ে গেল। নগদ টাকা যা ছিল, তাও জালালাবাদের পুলিশরা নিয়ে নিলে। তারপর ১লা জুন তারিখে আমাকে আফগানিস্থানের সীমানার বার করে দিলে।

পেশোয়ারে পৌছতেই আমি গ্রেপ্তার হলাম। চার মাস পর্য্যন্ত পুলিশের হেপাজতে আমায় রাখা হ'ল, এবং সে সময় আমাকে বহু থানায় ঘুরতে হ'ল। অনেক কষ্টে পুলিশের এই টানা-পোড়েনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম বটে, কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত আমায় জেলে থাকবার আদেশ হ'ল। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আমি আমার প্রদেশেই ছিলাম। এর পর আমি ভারত-সরকারের কয়েদী হয়ে পাঞ্জাব সরকারের হাতে ন্যাস্ত হলাম। সব মিলিয়ে আমাকে পেশোয়ার, লাহোর, ডেরাগাজী খাঁ ও রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি ছ'টি জেলের হাওয়া খেতে হ'ল।

এই তিন চার বছরের বেশি নজরবন্দী অবস্থায় থাকার পর, ভারত গবর্ণমেণ্টের হুকুম অনুযায়ী যখন আমি আবার পাঞ্জাব প্রদেশে ফিরে এলাম, তখন সকলে আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে দেখত। মানে, আমি যে পাঞ্জাবে আবার বদলি হয়ে এলাম এতে সবাই আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল। কারণ তারা জানত, একবার যে এ প্রদেশ থেকে বেরিয়ে অন্য প্রদেশে

যায়, সে সরকারের নজরে ভয়ানক বিপজ্জনক লোক। সে জন্য তারা আমাকে এবং আমার এক সাথীকে (যে আমার আসার দু'একদিন পরেই এসেছিল) বিশেষ করেই বিপজ্জনক লোক ভাবত। তারা আরো আমাদের ঐ ধরণের লোক মনে করত এই জন্যে যে, আমরা ভারত গবর্ণমেণ্টের কয়েদী ছিলাম, আর লাহোরে লালকেল্লার কোর্স ও পাশ করে এসেছিলাম। আমি দেখতাম যে কিছু লোক আমাদের গ্রেপ্তারের কারণ জানবার জন্যে এদিক-ওদিক খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। আমার কাবুলে গ্রেপ্তার হবার কথা শুনে, তাঁরা আরও আশ্চর্য্য হলেন। অবশ্য আমাদের গ্রেপ্তারের আসল কারণ সম্যকভাবে জানতে পারলে, তাঁদের সমবেদনা নিশ্চয়ই আরো বেশি হয়ে উঠত। সত্যি কথা বলতে কি, তারা গোড়া থেকেই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। গ্রেপ্তারের আসল কারণ জানবার পর, তাঁরা সকল সময়েই আমাকে আরও সহানুভূতির চোখে দেখতেন। আমার ও আমার সাথীর যা খাতির ও আপ্যায়ন পাঞ্জাবের দয়ালু কয়েদীরা (যারা আমাদের সঙ্গে জেলে ছিলেন) করেছেন, তার জন্য, তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ প্রকাশ করার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁদের দয়া ও ভদ্রতার ওজন এতো বেশি যে, আমার পক্ষে তার ভার বহন করা দুঃসাধ্য। তাঁদের ভদ্রতা ধন্যবাদের সঙ্গে স্বীকার করা ছাড়া উপস্থিত আমার আর কি করবার থাকতে পারে।

উক্ত সময় কতকগুলি লোক ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, আমি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্দ্ধানের ও তার পরের সম্পূর্ণ কাহিনী তাঁদের কাছে প্রকাশ করি। কিন্তু আমার পক্ষে প্রত্যেকের কাছে স্বতন্ত্রভাবে এই ঘটনার বর্ণনা ক'রে বেড়ান মোটেই সম্ভব ছিল না। হ্যাঁ, তবে কেউ যদি আমায় বিশেষ অনুরোধ করতেন, তাহলে শুধু এই বলে আমি নিজের প্রাণ বাঁচাতাম যে, 'সুভাষবাবু কাবুলের রাস্তা দিয়েই বার্লিন গেছেন।'

সুভাষবাবু সম্বন্ধে কিছু না বলার এও একটি কারণ ছিল যে, লাহোর জেলে পৌঁছতেই আমাকে দু'একজন ভদ্রলোক এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যেখানে সন্দেহ করার মত লোক থাকে বা যেখানকার লোকের কাছে বিপদের আশঙ্কা করা যায়—সেখানে এমন কোন কথা না বলাই উচিত, যাতে ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে হয়।

সত্যি কথা বলতে কি,—সে সময় এ কাহিনীর গুরুত্ব বিশেষ শোনবার মত ছিল না। সে সময় মধ্যে মধ্যে আমি মনে মনে ভাবতাম, সময় পেলে ভবিষ্যতে একদিন এই কাহিনী পুস্তকাকারে পৃথিবীর সামনে পেশ করব।

বোসবাবু কাবুলের ভিতর দিয়ে বার্লিন যাবার কথা যেই শুনত সেই আশ্চর্য্য হয়ে যেত। এরূপ কীর্ত্তি দুনিয়াতে একটি অদ্ভুত ঘটনা বলে তারা ভাবত। কেনই বা ভাব্‌বে না! একজন ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষের সীমা থেকে ছদ্মবেশে বিনা পাশপোর্টে অন্তর্দ্ধান হওয়া—তারপর পথের সমস্ত বিপদ-আপদ কাটিয়ে কাবুল যাওয়া ও কাবুল থেকে বার্লিন যাওয়া যদি অদ্ভুত ঘটনা না হয় তবে কাকে অদ্ভুত ঘটনা বলবে! তাছাড়া, এমন জবরদস্ত ইংরেজ রাজ যাদের প্রভাব হিন্দুস্থানের বাইরে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে, আর যাদের ডিটেকটিভ পুলিশের খরচা কোটি কোটি টাকার উপর—যাদের রাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র এমন ওতঃপ্রোতভাবে ভারতবর্ষকে বেষ্টন করে আছে—তাদের ব্যূহের ভেতর থেকে ভারতবর্ষের নেতা ও জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সুভাষবাবুর এই অন্তর্দ্ধান হওয়া ও তারপর সকলপ্রকার কষ্ট সহ্য করে, জনমানবহীন প্রান্তরের ভিতর দিয়ে নিজের পথ করে নেওয়াকে তারা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যের অন্যতম বলেই ভাবত।

এ ব্যাপারে বোসবাবু যে তাঁর ব্যক্তিত্বের অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁকে যাঁরা কাবুলে

পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁদের কৃতিত্বও এ ব্যাপারে বড় কম ছিল না। এ জন্য এ ক্ষেত্রে তাঁদের কথাও উল্লেখ না করে পারা যায় না।

যখন আমি রাওয়ালপিণ্ডি সেণ্ট্রাল জেলে বদলি হয়ে এসেছি ম, তখন দৈবক্রমে সেখানে অন্য কোন রাজবন্দী ছিল না। আমায় চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে একলাই রাখা হয়। সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেবও বরাতক্রমে অত্যন্ত কঠিন ও রুক্ষ প্রকৃতির লোক ছিলেন। পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট নিরাপত্তা বন্দীদের জন্যে যে নিয়মকানুন তৈরী করেছিলেন, সে অনুসারে চলা তিনি প্রয়োজন মনে করতেন না; বরং তিনি নিজেই নিয়মকানুন তৈরী করতেন। 'আমাকে তিনি সর্ব্বক্ষণ নজরবন্দী রেখে আমার সেলের দরজায় একজন সিপাহী নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই সময় যে কয়েকটি জেলে আমি ঘোরা ফেরা কল্লাম, কোন জেলেই কয়েদীর উপর এ ধরণের তীক্ষ্নদৃষ্টি দেখিনি। এ ধরণের ব্যাপারে কয়েকদিনের মধ্যেই আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল বটে, কিন্তু শীঘ্রই সে অবস্থা আমি অতিক্রম কল্লাম। নজরবন্দী অবস্থায় লাহোরের লালকেল্লায় আর পাঞ্জাবের কালাপানি ডেরাগাজি খাঁ জেলে যে ব্যবস্থা দেখেছিলাম, সে তুলনায় অবশ্য রাওয়ালপিণ্ডি জেলের চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা এমন কিছু মুস্কিল ছিল না।

এই ভাবে বেশ কিছু দিনের হায়রাণির পর আমার সেই পুরাতন খেয়াল, যা আমার মনের মধ্যে পূর্ব্বে থেকেই স্থান করে বসেছিল, তা আবার নতুন ক'রে জেগে উঠল। বোসবাবুর বার্লিন যাবার আকর্ষণীয় কাহিনী আমি লেখবার সিদ্ধান্ত করে ফেললাম। এই কাজে যে সময়টা আমি অতিবাহিত করতাম, সে সময়টা আমার খুব ভালোই লাগত।

...নক এই কাহিনীটি প্রকাশ করার ...
...টনা জানবার জন্যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব, ...
...্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। যে সকল কথা
...াসবাবুর মধ্যে হয়েছিল, আমি আমার স্মৃতি অনুযায়ী, যতদূর সম্ভব, সেই বাক্যগুলিই এই বিবরণে ব্যবহার করেছি। যদিও প্রায় চার বৎসরেরও পূর্ব্বে এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল, তবুও আমি যতদূর সম্ভব তারিখগুলি নির্ভুলভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। যদি কোন জায়গায় কোন ভুলভ্রান্তি থাকে তার জন্য আমার বিস্মৃতিই দায়ী। এই কাহিনীর মধ্যে অন্য কয়েকজন ভদ্রলোকও নিজের নিজের কর্ত্তব্য অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। ... না নেওয়ার জন্য, তাদের আসল নাম গোপন ... এই কাহিনীতে সেই মানুষগুলির আমি নতুন নাম ...

অবশেষে আমি একথাও প্রকাশ করতে চাই যে কোন বিশেষ দল বা তার সদস্যদের মনে আঘাত দেবার জন্যে আমি এই কাহিনী লিখিনি। ঘটনা যা ঘটেছিল, তাকেই লিপিবদ্ধ করা ... উদ্দেশ্য। আমার এই বর্ণনায় যদি কারুর মনে ... আঘাত লাগে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

...াহিনী আমি ...

...য়ের ...

...হা প্রকা... ...

হিন্দুস্থান টাইমস্‌"-এর ... প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি ...টি প্রকাশ করার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করলেন। "হিন্দুস্থান ...াইমস্‌"-এ এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ...গোড়ায় আমার ইচ্ছা ছিল যে, ক... সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর "হিন্দুস্থান",

এলাহবাদের "লীডার", পা... ...ইহা প্রকাশ করি। কিন্তু পরে অসংখ্য প... প্রকাশ করার অনুমতি চান। অনেকে অনুমতির ...ক্ষা না করেই, বেআইনী ভাবে এটির প্রকাশ স্থরু করে দেন। শেষ পর্য্যন্ত "হিন্দুস্থান টাইম্‌স্"-এর সম্পাদকের উপদেশ অনুসারে আমি ইহা প্রকাশ করবার অনুমতি দিই এবং একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকাশ-মূল্য ধার্য্য করি। এই নির্দ্দিষ্ট প্রকাশ-মূল্যের অর্দ্ধেক আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যকারী ফণ্ডে দেওয়া হবে। কাহিনীটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার অধিকার কেবলমাত্র আমার হাতে ছিল। আমার দেশের সমস্ত যুবকদের মধ্যেই কাহিনীটিকে প্রকাশ ...জন্য অসংখ্য পত্র ও তার আমি পেয়েছি। এই সকল ...অনুসারে প্রত্যেক ভাষাতেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করার ...। পুস্তক প্রকাশকগণ এই পুস্তকের মূল্যের শতকরা ...লটি আমাকে দিচ্ছেন। এই টাকা থেকে প্রথম দু'হাজারের সংস্করণের উপর শতকরা আড়াই টাকা "আজাদ হিন্দ ফৌজের" সাহায্যকারী ফণ্ডে এবং শতকরা দশ টাকা আমার প্রদেশের গান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খাঁকে দেবার সিদ্ধান্ত করেছি। পরের সংস্করণেও "আজাদ হিন্দ ফৌজের" সাহায্যকারী ফণ্ডে শতকরা আড়াই টাকা ও সীমান্ত গান্ধীকে শতকরা পাঁচ টাকা দেওয়া হবে।

এক্ষেত্রে ...র একটি কথা ...ম উল্লেখ করতে চাই যে, যখন আমি ডেরাগাজী খাঁ জেলে আবদ্ধ ছিলাম, তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট আমাকে জানিয়ে দেন যে, কাবুলে আমার যে সম্পত্তি ছিল, তা আফগান সরকার নিলামে বিক্রি করে দিয়েছেন। কাবুলে আমার সম্পত্তির মূল্য প্রায় এক লাখ টাকার উপর ছিল। কিন্তু আমি জানতে পারলাম যে, আফগান সরকার সেই সমস্ত সম্পত্তি মাত্র দশ হাজার

সূচনা

কাবুল, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ; ফেব্রুয়ারী মাস, শীতের প্রভাত আকাশ হইতে পাঁজায় পাঁজায় কার্পাসের মত বরফ ঝরিয়া পড়িতেছে। বরফে চারিদিকের পাহাড়গুলি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বাড়ীগুলির ছাদ তুষারসমাচ্ছন্ন, রাস্তাগুলি তুষারে ঢাকা। যেদিকে তাকানো যায় কেবল সাদা আর সাদা। তুষার রাশির সমুজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। প্রচণ্ড শীতে সমস্ত লোক গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় লইয়াছে, রাজপথ জনমানবহীন, বাজার অস্বাভাবিকভাবে শান্ত।

আমি আমার ঘরে বসিয়া তুষারের ফুল্‌কিগুলি দেখিতেছিলাম, এমন সময় হিন্দুস্থান ট্রেড এজেন্সী হইতে একটি পিয়ন একতাড়া ভারতীয় সংবাদপত্রসহ উপস্থিত হইল। সংবাদপত্র দেখিতে পাইলে চিরকালই আমি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠি। সংবাদপত্র পাঠ আমার একটা নেশার মত। খবর পাইয়াছিলাম যে, সুভাষ বসু তাঁহার গৃহ হইতে রহস্যজনকভাবে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। এ সম্পর্কে ভারতবর্ষ

হইতে বিস্তারিত খবর পাইবার জন্য আমার মন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। সেইদিন প্রাতেই দিল্লীর বেতার-কেন্দ্র হইতে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বোসবাবুকে হরিদ্বারে এক সাধুর ছদ্মবেশে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিপ্রহরেই আবার ঘোষণা করা হয় যে, উক্ত সাধু বোসবাবু নহেন।

কাগজগুলির উপর তাড়াতাড়ি আমি একবার চোখ বুলাইয়া গেলাম। এক জায়গায় দেখিতে পাইলাম যে, পাঞ্জাবের সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং কবিশের কোনও একটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, অন্তর্দ্ধানের কয়েকদিন পূর্ব্বে যখন তিনি বোসবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সংসার ত্যাগ করিবার চিন্তা করিতেছিলেন। সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট আরও বলেন, "আমার মনে হয় তিনি সা হইয়াছেন এবং দক্ষিণ ভারতের কোথাও গিয়াছেন।"

আগন্তুকের আগমন

আমি বসিয়া বসিয়া কাগজগুলি উল্টাইতেছিলাম, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক আমার দোকান-ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে 'আ সালাম আলাইকুম' বলিয়া অভিবাদন করিয়া পুস্তু ভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিধানে খাকি রংয়ের পেশোয়ারী সালোয়ার, একা

খাকি সার্ট, একটি চামড়ার জামা এবং তাহার উপর একটি চামড়ার ওয়েষ্টকোট। ওয়েষ্টকোটটির বুকে বোতাম আঁটা। তাঁহার মাথায় পাঠানদের ধরণে একটি পাগড়িও ছিল। পায়ে ছিল গরম মোজা এবং পেশোয়ারী চপ্পল। সীমান্তের খণ্ডজাতিগুলি এই ধরণের পোষাক পরিয়া থাকে। আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার জন্য আমি কি করিতে পারি ?

আগন্তুক অতি নিম্নস্বরে বলিলেন—আপনারই নাম কি উত্তমচাঁদ ?

আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিলাম, হাঁ আমার নাম উত্তমচাঁদ।

আমার উত্তর শুনিয়া আগন্তুক স্মিতহাস্য করিলেন। তাঁহার জন্য আমি কি করিতে পারি, আবার সেই প্রশ্ন করিলাম। অপরিচিত আগন্তুক কোন উত্তর না দিয়া কেহ আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিলেন। আমার দোকানে ১৫ বৎসর বয়স্ক একটি বালক কাজ করিতেছিল। তাহার নাম অমরনাথ। আমি তাহাকে আগন্তুকের জন্য একটি চেয়ার আনিয়া দিতে বলিলাম। তিনি উপবেশন করিলেন, কিন্তু একটি কথাও বলিলেন না।

বিরক্তিকর ভাবে কয়েক মিনিট কাল অতিবাহিত হইল। আমি আগন্তুককে বলিলাম—আপনার যাহা বলিবার আছে,

নিঃসঙ্কোচে বলুন। চুপ করিয়া আছেন কেন? বিনা কারণে নিশ্চয়ই এখানে আসেন নাই।

আবার তাঁহার চক্ষু চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল এবং দৃষ্টি অমরনাথের দিকে নিবদ্ধ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম যে, অমরনাথের উপস্থিতি তাঁহার কথায় বিঘ্ন ঘটাইতেছে। আমি অমরনাথকে একটু চা আনিতে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক নিশ্চিন্ত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—আমি একজন ভারতবাসী। একটা রাজনৈতিক ব্যাপারে এখানে আসিয়াছি। কিন্তু একটু মুস্কিলে পড়িয়াছি, তাই আপনার সাহায্য চাহিতেছি।

আমি বলিলাম—কিন্তু আপনি কে? আপনি আমার নাম জানিলেন কি করিয়া? আপনি আসিয়াছেন কি উদ্দেশ্যে এবং আপনার মুস্কিলই বা কি?

আগন্তুক—আমার বাড়ী উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মর্দ্দান জেলায় ঘালাঢের গ্রামে। আমার নাম ভগৎরাম। অনেক দিন আগে পাঞ্জাবের গবর্ণরকে গুলী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এমন কোন লোকের কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি ছিলেন আমার ভ্রাতা।

লোকটী যখন তাঁহার নাম এবং গ্রামের নাম বলিলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম। আমার মামা ঐ গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে জানিতে

পারিলাম যে, আমার মামী ভগৎরামের এক প্রতিবেশীর কন্যা। এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম লোকটি আমার নাম কি করিয়া জানিলেন। লোকটি তাঁহার জেলায় নওজোয়ান সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। আমি ছিলাম ঐ সভার জেনারেল সেক্রেটারী। সেই পদে থাকাকালে ১৯৩০ সালে আমি গ্রেফতার হই। এ কথা তিনি নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন। ঘালাঢেরের সকলেই জানে যে, কাবুলে আমার কাকার একটা দোকান আছে এবং আমি সেই দোকানে কাজ করি। ভগৎরাম আমার কাকাকে জানেন। ভগৎরাম বলিলেন যে, কাবুল অভিমুখে রওনা হইবার সময় তিনি আমার কাকাকে গ্রামে দেখিয়া আসিয়াছেন।

উদ্দেশ্য কি

আমি বলিলাম—এখন বলুন কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আপনার আগমন এবং আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করিতে পারি ?

তিনি বলিলেন—আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য এই —আমি সুভাষ বসুকে লইয়া আসিয়াছি ; তাঁহাকে গোপনে আফগান সীমান্ত পার করিয়া রাশিয়ায় পাঠাইয়া দিতে চাই। কিন্তু এক্ষণে—

লোকটি কথা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে বলিয়া ফেলিলাম—সুভাষ বোস? এখানে? আমার বুক দপ্‌দপ্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এমন সময় একজন খরিদ্দার দোকানে আসিয়া একটা জিনিষ চাহিল। তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার জন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, সে জিনিষ আমার দোকানে নাই।

অবশেষে আমি আত্মস্থ হইয়া বলিলাম—আচ্ছা, বলুন এখন আমাকে কি করিতে হইবে?

ভগৎরাম উত্তর করিলেন—এখন আমরা একটা সরাইতে আছি, কিন্তু একটা লোক আমাদের পিছনে লাগিয়াছে। লোকটাকে আফগান গোয়েন্দা বিভাগের লোক বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। সে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্যই বোসবাবু আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার এই বিপদের সময়ে আপনি কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন কিনা। তাহাই জানিতে আসিয়াছি।

আমি কহিলাম—আপনি বলিতেছেন যে, বোসবাবু আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, অথচ তিনি আমার নাম পর্য্যন্তও জানেন না। আপনারা দুজনে কি করিয়া জানিলেন যে, আমি এখানে আছি?

অমরনাথ চা লইয়া ফিরিয়া আসিল। আগন্তুক পুস্তু ছাড়িয়া উর্দ্দুতে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অমরনাথ তাহা বুঝিতে পারিল না।

আমার প্রশ্নের উত্তরে আগন্তুক বলিলেন—আপনি যখন নওজোয়ান ভারত সভার কাজ করিতেন, তখন হইতেই আমি আপনার নাম জানি। আমিও মর্দ্দান নওজোয়ান সভার একজন সদস্য ছিলাম। আমি প্রায়ই পেশোয়ার সভায় যাইতাম। দুই তিন বার সেখানে আপনাকে দেখিয়াছি। আমি জানি যে ১৯৩০ সালের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে আপনি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। আপনি যে এখানে আছেন তাহা আপনার কাকার নিকট হইতে জানিয়াছি। গ্রামের সকলেই জানে যে, কাবুলে তাঁহার একটি দোকান আছে এবং তাঁহার ভাইপোরা সেই দোকান চালাইয়া থাকেন। আপনাদের দুই ভাইকে আমি অনেক-বার দেখিয়াছি। আপনাদের দুই ভাইয়ের চেহারার মধ্যে এমন একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে যে, হঠাৎ দুই ভাইয়ের চেহারার মধ্যে প্রভেদ বাহির করা অসম্ভব। অনেকবার আপনাকে দেখিয়া আপনার ভাই বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছে। তাই আপনার ভাই'র সঙ্গে কথা না বলিয়া আপনার সঙ্গেই যে কথা বলিতেছি, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইবার জন্যই আমি আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কয়েকদিন আগে বোসবাবুর কাছে আমি আপনার কথা বলিয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আমার কথা উঠিল কোন প্রসঙ্গে?

আগন্তুক বলিলেন—বিশেষ কোন প্রসঙ্গে আপনার কথা উঠে নাই। আমরা এখানে আসিবার পর হইতেই মুস্কিলে পড়িয়া গেলাম; তাই সর্ব্বপ্রকার বিপদ-আপদের কথাই আমরা ভাবিতে লাগিলাম। সেই সম্পর্কেই আপনার কথা উঠিল। বোসবাবুকে বলিলাম, আমি এখানে একজন লোককে জানি। তাঁহার এখানে একটি দোকান আছে। ১৯৩৩ সালে জেলে তিনি গিয়াছিলেন, তিনি দেশের কথা বিশেষ চিন্তা করেন; বোসবাবু আমাকে আপনার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে বলেন। আজ অত্যন্ত দায়ে পড়িয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি। পাঁচ দিন যাবৎ ঐ গোয়েন্দাটা আমাদিগকে বড়ই বিরক্ত করিতেছে। প্রথম দিনই বোসবাবু লোকটাকে অত্যন্ত সন্দেহ করিয়াছিলেন এবং আমাকে অবিলম্বে আপনার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে বলিয়াছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনারা ত অনেক দিন এখানে আছেন। আপনাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোন সুবিধা হইয়াছে কিনা তাহা বলিতে কোন বাধা আছে কি?

ভগৎরাম—আপনাকে বলিতে কোন বাধাই নাই। আজ ফেব্রুয়ারী মাসের তিন তারিখ। তের দিন হইল আমরা এখানে আসিয়াছি। লাহোরী দরজার নিকট একটা সরাইতে আমরা ছোট একটি ঘর লইয়াছি। স্থানটা অতি জঘন্য। ব্যবসা উপলক্ষে যে সমস্ত উট ও গাধাওয়ালারা যাওয়া আসা করে, এই স্থানটি হইতেছে তাহাদের আড্ডা। এই কয় দিন

ধরিয়া রুশ দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। কোন অপরিচিত লোককেই রুশ দূতাবাসে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। কাজেই আমরা সফল হইতে পারি নাই।

একদিন দেখিতে পাইলাম একটি গাড়ী রুশীয় পতাকা উড়াইয়া চলিয়াছে। আমি শুনিয়াছিলাম যে, একমাত্র রাজদূতদের গাড়ী নিজ নিজ দেশের পতাকা উড়াইয়া চলিতে পারে। সুতরাং ঐ গাড়ীখানি দেখিয়া আমি মনে করিলাম, গাড়ীখানি নিশ্চয়ই রুশীয় রাজদূতের হইবে। গাড়ীখানি থামিল। গাড়ীখানির চালক ছাড়া আর একজন লোক পিছনের আসনে বসিয়াছিলেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা পার্‌সীতে আমি বোসবাবুর কথা লোকটিকে বলিলাম। পার্‌সী ভাষা আমি সামান্যই জানি। তিনি যে উত্তর দিলেন, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি বলিতেছেন—ইনি যে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নে আমার সমস্ত আশা চূর্ণ হইয়া গেল। আমরা তাঁহাকে ভাল করিয়া কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে, যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি প্রকৃতই বোসবাবু। আমরা চুপ করিয়া রহিলাম, তিনি গাড়ী চালাইয়া চলিয়া গেলেন।

আমি বলিলাম—আপনি পার্‌সী ভাষা ঠিক ঠিক জানেন না বলিয়াই এবং আপনার সঙ্গে কোন পরিচয় পত্র না

থাকাতেই আপনি রুশ দূতাবাসের সহিত এতদিন যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন নাই।

ভগৎরাম বলিলেন, হয়ত বা তাহাই হইবে।

আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, যাঁহারা বোসবাবুকে কাবুলে পাঠাইয়াছেন তাঁহারা এমন একজন লোকের সঙ্গে কেন তাঁহাকে পাঠাইলেন যিনি এ সমস্ত ব্যাপারের ক খ গও জানেন না। এমন একজন অভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে পাঠানো উচিত ছিল, পারসী এবং রুশ ভাষায় যাঁহার যথেষ্ট দখল রহিয়াছে। তাহা যদি সম্ভব না হয় তবে এমন একজন লোক সঙ্গে দেওয়া উচিৎ ছিল, যাঁহার রাশিয়ান দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে।

ইতালীয় দূতাবাসের সাহায্য

ভগৎরাম বলিতে লাগিলেন—রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সকল আশা যখন বিনষ্ট হইল তখন আমরা ইতালীয় দূতের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিলাম। এইদিক দিয়া আমাদের চেষ্টা সফল হইল। কি ভাবে কি হইল সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আপনি পরে ইহা শুনিতে পাইবেন; তবে উহাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। ইতালীয় দূত আমাদের ভাবনা দূর করিয়া বলিলেন,—যতদূর সত্বর সম্ভব আমরা বোসকে বার্লিন অথবা রোমে পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

আমি প্রশ্ন করিলাম—এখন বলুন, আমার নিকট হইতে আপনাদের কি সাহায্য চাই ?

ভগৎরাম—প্রথমে আমরা যাহাতে এখানে নিরাপদে থাকিতে পারি এমন একটা জায়গা ঠিক করিয়া দিন। তারপর রুশীয় দূতের সহিত আপনার যদি কোন যোগাযোগ থাকে তাহা হইলে বোসবাবুকে মস্কো পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন। কেন না, আমরা চক্রশক্তির (Axis powers) একটির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছি বটে, কিন্তু বোসবাবু বার্লিন বা রোমে যাইতে ইচ্ছুক নহেন।

আমি—আপনারা আমার বাড়ীতে থাকিতে পারেন কিন্তু আমার বাড়ীটা আমি নানা কারণে নিরাপদ মনে করি না। কারণ, আমার বাড়ীতে আর একজন ভাড়াটে আছেন। তিনি পরিবার সহ নীচ তলায় থাকেন, আমরা উপর তলায় থাকি।

আমার বাড়ীর অপর ভাড়াটিয়া পেশোয়ারের লোক। তিনি কাবুলে কাপড়ের ব্যবসা করেন। অধিকন্তু আমার বাড়ী হিন্দু গুজারে ছিল। স্থানটি জঘন্য—সহরের কদর্য্যতম। সুভাষবাবুকে এখানে রাখিতে আমি এই জন্য অনিচ্ছুক।

ভগৎরাম হাসিয়া বলিলেন—আমরা এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে ধূলা ময়লাকে কে গ্রাহ্য করে ? তবে আপনার ঐ অপর ভাড়াটিয়ার কথাটা চিন্তার বিষয় বটে।

আমি অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। নিকটেই আমার এক মুসলমান বন্ধুর একটী চমৎকার বাড়ী ছিল। আমি এবং তিনি একই অঞ্চলের লোক। যৌবনকালে তিনি সেনাবিভাগে কাজ করিতেন। কিন্তু তিনি ইংরাজ অফিসারদের সহিত কলহ করিয়া ১৯ বৎসর বয়সের সময় কাজ ছাড়িয়া দেন। তাহার পর তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল চীন, জাপান, জার্ম্মাণী এবং আমেরিকাতে কাটাইয়াছেন। তিনি একটী জার্ম্মান নারীকে বিবাহ করিয়াছেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইয়াছে। বেশ একটু ইংরাজ বিদ্বেষী। তিনি মক্কায় তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন। এই জন্য আমরা তাহাকে হাজী-সাহেব বলিয়া ডাকি। তিনি তাঁহার বাড়ীতে একটি মোজা গেঞ্জীর কারখানা বসাইয়াছেন। সেই কারখানাই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। সুভাষবাবু ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্দ্ধান করার পর তিনি তাঁহার সম্পর্কে প্রায়ই নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তিনি বলিতেন—বসু হইতেছেন ভারতের সিংহ। তিনি সুভাষবাবুকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন কিনা, একথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব কিনা, তাহা আমি ভগৎরামের কাছে জানিতে চাহিলাম।

ভগৎরাম বলিলেন—যদি আপনি মনে করেন যে, তিনি আমাদিগকে ধরাইয়া দিবেন না তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি সম্মত না হন?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অসম্মত হইবেন না। যদি তিনি অসম্মত হনও তবে আমার বাড়ীর দরজা তো সব সময়ই খোলা রহিয়াছে, সেখানে আসিয়া বোসবাবু থাকিতে পারিবেন।

ভগৎরাম বলিলেন—উহা লইয়া আর মাথা ঘামাইবেন না। বোসবাবু যদি ঐ কদর্য্য সরাইয়ে থাকিতে পারেন তাহা হইলে তিনি অন্য যে কোন স্থানে থাকিতে পারিবেন। আমার দেরী হইয়া যাইতেছে, এখনই আমার ফিরিয়া যাইয়া বোসবাবুর সেবাযত্ন করিতে হইবে। এখন বলুন আমি কি করিব। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে যে, আজ রাত্রিতে সরাইয়ে থাকাটা নিরাপদ নয়।

আমি বলিলাম—তৃতীয় কোন উপায় যখন দেখিতেছি না, তখন আপনারা বিকালে চারিটার সময় আমার কাছে আসিতে পারেন। ইতিমধ্যে আমি হাজি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। যদি তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি বোস-বাবুকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইব; নতুবা আমার বাড়ীতো আছেই।

আগন্তুক চলিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি ত পাঠানের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছেন—কোন ছদ্ম নামও গ্রহণ করিয়াছেন কি?

তিনি উত্তর দিলেন—নিশ্চয়ই করিয়াছি; নতুবা চলিবে কেন। আমার নাম রহমৎ খাঁ আর বোসবাবুর নাম জিয়াউদ্দিন। আচ্ছা, আমি চারিটার সময় বোসবাবুকে লইয়া আসিব।

আগন্তুক চলিয়া গেলে অকস্মাৎ আমাকে যেন একটা দুর্ব্বলতা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল! ভাবিতে লাগিলাম—ইংরাজরা নিশ্চয় বোসবাবুর পিছন লইয়াছে, তাহারা নিশ্চয় তাঁহাকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বিশেষ করিয়া নিশ্চয়ই ভারতীয় সীমান্তবর্ত্তী দেশ সমূহে তাঁহাকে বেশী খোঁজা হইতেছে! যদি হাজী সাহেব তাঁহাকে আশ্রয় দিতে রাজী না হন তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কি আমাকেই তাঁহাকে আশ্রয় দিতে হইবে? তাঁহাকে যদি আমার বাড়ীতে পাওয়া যায় তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে? আমার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার স্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করা হয়, তাহা হইলে এই বর্ব্বর দেশে আমার ছেলেপিলের গতি কি হইবে? আফগানিস্থানের ভারতীয়রা এত আতঙ্কগ্রস্ত যে, তাহারা নিশ্চয় আমার ছেলেপিলেকে আশ্রয় দিতে চাহিবে না।

সল্পক্ষণ পরেই আমার এই দুর্ব্বলতা ও দুশ্চিন্তা কাটিয়া গেল।

হাজী সাহেব নারাজ

আমি দোকান ছাড়িয়া হাজী সাহেবের বাড়ীতে গেলাম। তিনি বাড়ী ছিলেন না, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, আমার কথা শুনিতে পায় কাছাকাছি এমন কোন লোক নাই। তখন আমি তাঁহার নিকট আমার আগমনের উদ্দেশ্য খুলিয়া বলিলাম। আমি বলিলাম যে, একটা রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া কয়েকজন লোক ভারতবর্ষ হইতে গুপ্তভাবে এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা আপনার আশ্রয় চাহেন।

হাজী সাহেব হাসিয়া উত্তর দিলেন—আপনি দেখিতেছি অতি সরল প্রকৃতির লোক। এ সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব আপনি কিছুই বুঝেন না বা জানেন না। এইরূপ ব্যাপারে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। ইউরোপে আমি অনেক ভারতীয়কে এইরূপ সাহায্য করিয়াছি, ফল কিছুই হয় নাই। লাভের মধ্যে আমাকে নানা রকম দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। স্বয়ং খোদাও যদি আসিয়া এখন আমার বাড়ীতে আশ্রয় চাহেন, আমি তাঁহাকেও আশ্রয় দিব না। আমি জানি যে, ভারতীয়রা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তাহার পর আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি—রাজনৈতিক হাঙ্গামায় এখন আর নিজেকে জড়াইতে চাহি না।

আমার বন্ধুদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায় আমি তাঁহাকে তিরস্কার করিলাম। তিনি আমাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—

বিরক্ত হইও না, এইরূপ কাজ করিতে করিতে আমি বুড়া হইয়া গিয়াছি। আমার মত আরো অনেকে এইরূপ কাজ করিতে যাইয়া ঠকিয়াছে। তোমার নিকট যে লোকটি আসিয়াছেন, তিনি হয়তো বিশ্বাসযোগ্য, যাক তাঁহার নামটি কি বলতো?

উত্তরে আমি বলিলাম—আপনি যখন তাঁহাকে সাহায্য করিতে রাজী নহেন, তখন আর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ কি?

তিনি বলিলেন—বলিতেছিলাম কি যে, তিনি যদি ভারতের কোন বিশ্বাসযোগ্য নেতা হন, তাহা হইলে হয়তো আমি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেও দিতে পারি।

আমি—আপনি নিজেই অনুমান করুন।

হাজী সাহেব—তুমি তো আর সুভাষ বসুকে হাজির করিতে পারিবে না? পারিবে কি?

আমি সদর্পে বলিলাম—তবে সুভাষ বোস-ই।

হাজী সাহেব স্তম্ভিত ও হতভম্ভ হইয়া গেলেন। তিনি অবিশ্বাসের ভাবে 'বোস' 'বোস' বলিয়া আওড়াইতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এখন আপনি কি বলেন?

হাজী সাহেব—আমি তাঁহাকে রাখিতে রাজী। তুমি ত আমার বাড়ীটি দেখিয়াছ—বলতো কোন ঘরে তাঁহাকে রাখি?

আমি বলিলাম—মেসিন ঘরের পাশের ঘরটিতে রাখুন।

হাজী সাহেব ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—জানতো, আমার বাড়ীটা একটা কারখানা। সেখানে প্রত্যেক দিন আট জন লোক কাজ করিতে আসে; তাহার উপর আবার রহিয়াছে খরিদ্দারগণের আনাগোনা। আমার স্ত্রী জার্ম্মাণ। তাঁহার কোন পর্দ্দার বালাই নাই। যাহারা আমার বাড়ীতে আসে, তাহারা অবাধে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া যায়। এমন অসুবিধার মধ্যে বলতো আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেই। আমার মনে হয় তোমার বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।

হাজী সাহেবকে আমি বলিলাম—আমার বাড়ীটা বড়ই নোংরা; বাড়ীতে লোকও অনেক বেশী। তাহার উপর আবার আর একজন ভাড়াটিয়াও আছেন। তা' থাক, আপনি যখন রাজী হইলেনই না, তখন আমার বাড়ীতে তাঁহাকে আশ্রয় না দিয়া উপায় নাই।

হাজী সাহেবের কাছ হইতে বিদায় লইয়া দোকানে ফিরিয়া আসিলাম।

চারিটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী। রহমৎ খাঁ আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি একাই আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—দাস-বাবু কোথায়?

আমার দোকানের ধার দিয়াই কাবুল নদ বহিয়া যাইতেছে। রহমৎ খাঁ কাবুল নদের অপর তটে দণ্ডায়মান একটি লোককে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু আমি ঠিক বোস-বাবুকে দেখিতে পাইলাম না।

রহমৎ খাঁ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—ঐ তো তিনি ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনি কি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না? যাক, আপনি তাঁহাকে সহজে এখন চিনিতে পারিবেন না। তাঁহার পোষাক এবং চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

রহমৎ খাঁ যে লোকটিকে দেখাইয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিতে ঠিক পাঠানের মত মনে হইয়াছিল।

প্রথম সাক্ষাৎ

আমি আগেই অমরনাথকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম। তাহাকে বলিয়া দিলাম সে যেন আমার স্ত্রীকে বলে, আমার দুই জন অতিথি আজ আসিবেন, তাঁহারা আমার এখানেই খাইবেন। তারপর দোকান বন্ধ করিয়া রহমৎ খাঁয়ের সঙ্গে চলিলাম। আমার দোকান হইতে এক পোয়া মাইলের মধ্যে একটি সেতু ছিল। বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, বোস-বাবু সেখানে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবেন। ঠিক সময়ের কয়েক মিনিট আগেই আমরা সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে তাঁহাকে দেখিতে না

পাইয়া, যেদিক হইতে তিনি আসিবেন কথা ছিল, সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। সে সময় কাবুলের আপিসগুলি বন্ধ হইয়াছে। সেতুর উপর লোকজনের বেশ ভিড়। কয়েক পা অগ্রসর হইয়াই রহমৎ খাঁ বলিলেন—এই যে তিনি আসিয়াছেন।

বাস্তবিক, বোসবাবুকে ঠিক পাঠানের মতই দেখাইতেছিল। অনেক দিন ধোওয়া হয় নাই এমন একটি অপরিষ্কার শালোয়ার তিনি পরিয়াছিলেন ; তাঁহার শার্টটিও ছিল ঠিক তেমনি নোংরা।

রাস্তায় বেশ বরফ পড়িয়াছিল। রাস্তার দুই ফুট গভীর বরফের উপর দিয়া আসিবার সময় তাঁহার মোজা ভিজিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। তিন ইঞ্চি লম্বা দাড়ি তাঁহার সমস্ত মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। সেই সুপরিচিত চশমা তাঁহার চোখে ছিল না। গলায় একখানি নোংরা চাদর জড়ান ছিল। পাগড়ীর একটা দিক তাঁহার সম্মুখে এবং অপর দিকটা পিছন দিকে ঝুলিতেছিল। আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম—সত্যই কি ইনি বোস-বাবু?

আমার চিন্তাধারায় হঠাৎ বাধা দিয়া রহমৎ খাঁ আমার স্কন্ধে ধাক্কা দিয়া বলিলেন—চলুন, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছেন?

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই আমি রহমৎ খাঁকে বলিলাম -আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন, ইহা কতকটা

সন্দেহজনক দেখায়। আপনি আমার পিছনে পিছনে চলুন। আপনার কয়েক পা পিছু পিছু বোসবাবু আসুন।

আমার বাড়ী সেতু হইতে মাইল খানেকের পথ। রাস্তাটা বিশ্রী, মাঝে মাঝে গর্ত্ত; সেই গর্ত্তগুলি এখন বরফে ভরিয়া গিয়াছে। চলিতে চলিতে বোস-বাবু কয়েকবার তাহাতে হোঁচট খাইলেন। বাজারের মধ্য দিয়া রাস্তাটা কোন মতে আমরা পার হইলাম। এখন একটা ছোট গলি পার হইতে পারিলেই বাড়ী পৌঁছিতে পারি এবং মনের দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হয়। লোকেরা নিজ নিজ বাড়ী হইতে বরফ ঝাঁটাইয়া রাস্তার উপর আনিয়া জমা করিয়াছে; সেজন্য এই উঁচু নীচু পথে চলিতে বেশ কষ্ট হইতে লাগিল। আমরা তিন জন ছাড়া সে সময় গলিটার মধ্যে আর কেহ ছিল না। গর্ত্তগুলি ছিল বিশ্রী রকমের। আমি বোস-বাবুর কাছে আসিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলাম। একবার বোসবাবুর পা একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেল। তিনি প্রায় পড়িয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় আমি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। আমার একজন প্রতিবেশী সেখান দিয়া যাইবার সময় বোস-বাবুর দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন—কি জানি এই বেচারা মুসাফির কোথা হইতে আসিয়াছে। তাহার পর বোসবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাইজী, আপনি কি কোন ধরমশালায় যাইতে চাহেন?

আমি প্রতিবেশীকে বাধা দিয়া বলিলাম—"চল, আমরা আগাইয়া যাই। ইনি যেখানে যাইতে চাহেন সেখানে নিজেই যাইবেন। এই অপরিচিত মুসাফিরকে লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের দরকাব কি? কে জানে লোকটা কে? এই কথা বলিয়া কাবুলী প্রতিবেশীর সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। পরবর্ত্তী মোড়ে গিয়া আমি জুতার ফিতা বাঁধিবার অছিলায় প্রতিবেশীর পিছনে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার দেরী হইতেছে দেখিয়া কাবুলী প্রতিবেশীটি আগাইয়া চলিয়া গেল। রহমৎ খাঁ এবং বোসবাবু আসিয়া আমার নাগাল ধরিলেন। অবশেষে আমরা সকলে বাড়ীতে পৌঁছিলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় কেহই আমাদিগকে দেখিতে পাইল না। প্রচণ্ড শীতের দরুণ প্রতিবেশীরা সকলেই দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আগুনের পাশে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে।

বাহিরে প্রবল তুষারপাত হইতেছিল। কাজেই বোসবাবুকে গরম রাখিবার জন্য একটা কয়লার উনান আনাইলাম। তাহার পর একটু চায়ের ব্যবস্থাও করিলাম। বোসবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি স্নান করিবেন কি না। তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন—না, এখন আর স্নান করিব না। কাল স্নান করিব। তখন গরম জলের দরকার হইবে। আফগানি মাটিতে পা দিবার পর স্নান কাহাকে বলে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

বোসবাবু ভিজা মোজা খুলিয়া ফেলিলেন। ঠাণ্ডায় তাঁহার পা অবশ হইয়া গিয়াছে, শালোয়ারও ভিজিয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাকে একটি শার্ট ও শালোয়ার আনাইয়া দিলাম। তিনি কাপড় বদলাইলেন। তাহার পর চশমা পারিলেন। কাবুলে আসিয়া ইহাই তাঁহার প্রথম চশমা পরা। চশমা পরার পর তাঁহার পরিচিত চেহারা আমি বেশ চিনিতে পারিলাম।

চা ঢালিবার আগে, আমার গরীবখানায় তাঁহার যদি কোন কষ্ট হইয়া থাকে, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

বোসবাবু বলিলেন—কি ছেলেমানুষের মত কথা বলিতেছেন। আমার বর্ত্তমান বিপদের সময় আপনি আমার জন্য যাহা করিলেন তাহা আমি কোন দিনও ভুলিব না। আমার মনে হইতেছে, আমি যেন নিজ বাড়ীতেই আসিয়াছি।

চা খাওয়া শেষ হইলে রহমৎ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সরাইতে আপনাদের কত পোঁটলা-পুঁটলী আছে?

রহমৎ খাঁ বলিলেন—এমন বেশী কিছু নয়। তবুও একটি কুলি ছাড়া উহা আনা যাইবে না; আনিতে গেলে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। আমি যদি কুলি সঙ্গে লইয়া এখানে আসি, সেই সি-আই-ডি শূয়রটা হয়তো আবার আমার পিছনে লাগিবে।

আমি বলিলাম—আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি অমরনাথকে সঙ্গে লইয়া যান। সাবধান, সি-আই-

ডি'টা যেন অমরনাথকে দেখিতে না পায়। আপনি আগে সরাইতে ঢুকিয়া পড়িবেন, তাহার পর অমরনাথ কুলি লইয়া যাইবে, তাহা হইলেই ভাল হইবে। আপনি আপনার কামরার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, যেন অমরনাথ আপনাকে দেখিতে পাইয়া সেখানে যাইতে পারে। অমরনাথের কাছে মালপত্র দিয়া দিবেন, সে উহা লইয়া চলিয়া আসিবে। তাহার পর আপনি সরাইওয়ালার পাওনাগণ্ডা মিটাইয়া দিয়া চলিয়া আসিবেন।

বোসবাবু বলিলেন—তাহাই ভাল হইবে। তবে খুব হুঁসিয়ার, কেহ যেন আপনার পিছু না লয়। যদি কাহাকেও সন্দেহ হয় তাহা হইলে এদিক ওদিক ঘুরিয়া সরিয়া পড়িবেন।

আমি অমরনাথকে ডাকিয়া সব কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম এবং রহমৎ খাঁয়ের সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

অমরনাথ চলিয়া যাওয়ার পর অতিথির খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কতদূর কি হইল তাহা জানিবার জন্য স্ত্রীর কাছে গেলাম। তিনি সন্দিগ্ধ ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার এই অতিথি কে?

আমি—ইনি লাগমান হইতে আসিয়াছেন।

লাগমান জালালাবাদ জিলার একটি গ্রাম। আমার স্ত্রী জানিতেন যে আমাদের কয়েকজন আত্মীয় এবং খরিদ্দার ঐ গ্রামে থাকে।

আমার স্ত্রী বলিলেন—আমি তো লাগমান হইতে যাহারা পেশোয়ারে আসা যাওয়া করে তাহাদের সকলকেই চিনি। কৈ এই লোকটিকে তো আমি কখনও পেশোয়ারে দেখি নাই ?

আমি—তা কি করিয়া তুমি দেখিবে ? তিনি একবার মাত্র পেশোয়ারে আসিয়াছিলেন। সে সময় আমি তাঁহাকে আমার বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনও কারণবশতঃ তিনি তখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

স্ত্রী—এখন কেমন করিয়া আসিলেন ? তা যাউক, বল ইনি কে ? মনে হয়, তুমি সত্য কথা বলিতেছ না।

আমি—তুমি বুঝি ভাব যে, এতক্ষণ আমি তোমার কাছে শুধু মিথ্যা কথাই বলিয়া আসিতেছি ?

স্ত্রী—এ যদি মিথ্যা না হয় তবে আর কি ? লোকটি মুসলমান, আর তুমি কিনা আমাকে বুঝাইতে চাহ যে, তিনি হিন্দু।

আমি—তুমি একটি উন্মাদ।

স্ত্রী—যা তোমার প্রাণ চায় তাই কর। অমরনাথের কাছ হইতে সব কথা শুনিবার পর হইতেই আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ লাগিতেছে।

এতক্ষণে বুঝিলাম, অমরনাথের নিকট হইতে সমস্ত শুনিয়াই আমার স্ত্রীর মনে এই অতিথির সম্বন্ধে ঘোরতর

সন্দেহ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—অমরনাথ তোমাকে কি বলিয়াছে ?

স্ত্রী—আমি সব কথাই জানি। দাড়িওয়ালা লোকটি আসিয়া তোমাকে কি ভাবে মুসলমানের মত সেলাম করিল। তুমি তাঁহার সঙ্গে পুস্তুতে কথা বলিলে, মুসলমানের দোকান হইতে চা আনাইলে—সব কথাই আমি জানি। তারপর তিনি পুস্তু ছাড়িয়া হিন্দুস্থানী বলিতে আরম্ভ করিলেন। সত্য কি না বল দেখি ?

আমি মনে করিয়াছিলাম যে, বোস-বাবু মাত্র কয়েক দিনের জন্যই আমার বাড়ীতে থাকিবেন, সুতরাং তাঁহার আসল পরিচয় গোপন রাখাই ভাল। কিন্তু যখন এতদূর গড়াইয়াছে, তখন আর স্ত্রীর কাছে আসল কথা প্রকাশ না করিয়া উপায় নাই। স্ত্রীকে বলিলাম—আচ্ছা, পরে সব কথা তোমাকে খুলিয়া বলিব।

স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়া আমি সুভাষবাবুর কাছে ফিরিয়া আসিলাম।

সরাইতে তের দিন

সে সময় ঘরে একমাত্র সুভাষবাবু এবং আমিই ছিলাম। সেই আফগান সি আই ডির লোকটা তাঁহাদের পিছনে কি করিয়া লাগিল এবং তাঁহাদিগের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বোসবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—আজ ফেব্রুয়ারী মাসের তিন তারিখ। তের দিন হইল আমরা এখানে আসিয়াছি। ১৯শে জানুয়ারী পেশোয়ার ছাড়ি। এখানে পৌঁছিতে তিন দিন লাগে। পথে দারুণ শীত। এখানে যখন পৌঁছিলাম তখন দেখি ভীষণ বরফ পড়িতেছে। আমি আগে কখনও এ অঞ্চলে আসি নাই। রহমৎ খাঁরও একই অবস্থা। রাস্তায় একটা জায়গা আছে যেখানে আসিয়া পুলিশকে ফাঁকি দিবার জন্য লরী ড্রাইভাররা আরোহীদিগকে নামিয়া যাইতে বলে। আপনি হয়তো সে জায়গাটা জানেন। বোধ হয়, সেখানে একটা চুঙ্গির ফাঁড়িও আছে। দেখিলাম একজন লোক আসিয়া আমাদের লরীর মালপত্র পরীক্ষা করিল এবং একটা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া চলিয়া গেল।

আমি—বোধ হয় আপনি লাহোরী দরজার কথা বলিতেছেন। উহার সম্মুখেই একটা মস্ত বড় মাঠ।

সুভাষবাবু—তাই বটে। লাহোরী দরজায় সে সময় খুব বরফ পড়িতেছিল। একখানা পালকিও কাছাকাছি ছিল না। আর থাকিলেই বা কি হইত, আমাদের কোনও কাজে উহা লাগিত না। আমরা কোথায় যে যাইব তাহাও জানিতাম না। শেষে দূরে কয়েক জন লোককে দেখিতে পাইলাম। সেদিকে রওনা হইলাম। কাদা এবং বরফের মধ্য দিয়া চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। কোন ক্রমে

বাজারে পৌঁছিলাম। রহমৎ খাঁ একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল, আশেপাশে থাকিবার মত একটু স্থান কোথাও মিলিবে কিনা। লোকটা একটা সরাইখানা দেখাইয়া বলিল—ঐ সরাইতে যাও, ঐ সরাইতে অনেক ছোট ছোট কুঠরি আছে। মুসাফিরদিগকে ঐ কুঠরি ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে। একটা হয়ত তোমরা পাইতে পার।

আমরা দুইজনে সরাইতে গেলাম। সরায়ের উঠানে খুঁটির সঙ্গে কতকগুলি উট এবং ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে; বারান্দায় কয়েকটি গাড়ীও রহিয়াছে। যায়গাটি এতই বিশ্রী ও নোংরা যে দেখিয়া মনে হইল, কোন মানুষের বাসযোগ্য এ স্থান নহে। যে লোকটা আমাদিগকে এখানে আসিতে বলিয়াছে, সে সম্ভবতঃ আমাদের সঙ্গে তামাসা করিয়াছে। যাহা হউক, চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে ভিতরে ঢুকিলাম। কুঠরি কোথাও খালি আছে বলিয়া মনে হইল না। তারপর দেখিলাম একটি লোক সরাইতে ঢুকিতেছে। রহমৎ খাঁ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সরাইওয়ালা কোথায়। লোকটি মেজাজ দেখাইল কিন্তু কোন উত্তর দিল না। পরে জানিলাম যে, লোকটা পুস্তু জানে না। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, আফগানদের মাতৃভাষা পুস্তু, এখানে আসিয়া দেখি যে, তাহাদের মাতৃভাষা পুস্তু নয়, পারসী। এখানে খুব কম লোকই পুস্তু জানে। রহমৎ খাঁ শুধু পুস্তু জানে বলিয়াই যত মুস্কিল হইয়াছে।

কয়েক মিনিট পর দেখিলাম একজন লোক উপরতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিতেছে। রহমৎ খাঁ তার কাছে সরাইওয়ালার; কথা জিজ্ঞাসা করিল। বড় ফটকের পাশে একটি ছোট কুঠরি দেখাইয়া লোকটি বলিল—ঐ কুঠরিতে সরায়ের চৌকিদার থাকে, তাহার কাছে যাও, সব খবর ওখানে পাইবে। সেই কুঠরিতে যাইয়া দেখি একটি লোক লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। তাহার চেহারা গুর্খা অথবা চীনাদের মত মঙ্গোলীয় ধরণের।

বোস-বাবু কোন জাতের কথা বলিতেছেন এখন বুঝিতে পারিলাম; আফগানিস্থানের হাজারা অঞ্চলে এই জাতীয় লোকের বাস। লোকটি সেই জাতীয়ই বোধহয় হইবে। হাজারা অঞ্চলে বার মাস বরফ পড়ে। আফগানদের মধ্যে সেখানকার লোকই সবচেয়ে গরীব। তাহাদের চেহারা মঙ্গোলীয় ধরণের।

সুভাষবাবু বলিতে লাগিলেন—চৌকিদারটি আমাদের পুস্তুতে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের এখানে কি চাই। রহমৎ খাঁ তাহাকে বলিল যে, আমরা মুসাফির, রাত্রির মত সরাইতে থাকিতে চাই। যদি কোন ঘর খালি থাকে, আমাদের দাও, যা ভাড়া লাগে আমরা দিব।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে, লোকটা কিছু কিছু পুস্তু জানিত। তাহা না হইলে এখানে দোভাষী কোথায় পাইতাম, জানি না। চৌকিদার আমাদিগকে উপরতলায় লইয়া গেল; এবং একটা অন্ধকার ঘর দেখাইয়া বলিল যে, উহার দরুণ ১৲ টাকা (আফগানী) দিতে হইবে। কারাগারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদিগকে যে ধরণের ঠাণ্ডা গারদে রাখা হয়, এই ঘরটা তাহা অপেক্ষাও জঘন্য। দরজা বন্ধ করিয়া দিলে দিন, না রাত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। . . .

কিন্তু আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছিলাম তাহাতে সে অন্ধকার ঘরটাও আমাদের পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইল। আমাদের পা আর বহিতেছিল না। যে দারুণ শীত পড়িয়াছিল, তাহাতে হিম শীতল মেজের উপর শোওয়া অসম্ভব। রহমৎ খাঁকে চৌকিদারের নিকট হইতে জানিয়া আসিতে বলিলাম, দুইটা বিছানা পাওয়া যায় কি না। আমরা বিছানা চাই জানিয়া চৌকিদার খুব খুসী হইল; কারণ একেকটা বিছানার এক দিনের ভাড়া একেকটি আফগানী আধুলি। আমরা দুইটি বিছানা পাইলাম। তাহার পর রহমৎ খাঁ কিছু কাঠ লইয়া আসিল। কাঠগুলি ছিল একেবারে ভিজা, আগুন জ্বালান গেল না, প্রচুর ধুঁয়ায় ঘরটা ভরিয়া গেল। এদিকে বাহিরে জোর ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল, দরজা খুলিতে পারিতেছি না। ধুঁয়ার চোটে দম বন্ধ হইবার জোগাড় হইল। পরে কিছু

শুক্‌না কাঠ সংগ্রহ করিয়া শরীরটা একটু গরম করিয়া লইলাম।

সন্ধ্যাবেলা রহমৎ খাঁ বাজার হইতে মোমবাতি কিনিয়া আনিল। কিছু শুক্‌না রুটি এবং কাবাবও সেই সঙ্গে আনিল। আমি ঐ দাঁতভাঙ্গা রুটি চিবাইয়া খাইতে পারিলাম না। তখন সে এক পেয়ালা চা আনিল। চায়ে ভিজাইয়া কোন রকমে রুটি খাইলাম। সেই রাত্রে দুজনেই খুব এক চোট ঘুমাইলাম। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে আমাদের সমস্ত দেহের গাঁটগুলিতে দারুণ বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম।

প্রাতঃভোজনের পর রহমৎ খাঁ দুইটি চামড়ার ফতুয়া, একটি কেৎলী এবং দুইটি ছোট সতরঞ্চি কিনিয়া আনিল।

সুভাষবাবু বলিতে লাগিলেন—ছয় দিন পরে রহমৎ খাঁ আসিয়া বলিল, একটা সাদা পোষাক পরা লোক রোজই রুটিওয়ালার দোকানে বসিয়া থাকিতে দেখিতেছি। আজ সে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতেছিল। মনে হয়, লোকটা আফগান গোয়েন্দা বিভাগের।

আমরা খাওয়া শেষ করিয়াছি, এমন সময় সেই কনেষ্টবলটা আসিয়া আমাদের কুঠরীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সে গরম কর্ত্তৃত্বের সুরে পুস্তুতে আমাদের জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কে? কি মতলবে এখানে আসিয়াছ?

রহমৎ খাঁ তাহাকে বলিল—আমরা মুসাফির, সীমান্ত হইতে আসিয়াছি। ইনি আমার ভাই, কানে কিছুই শুনিতে পান না, কথা বলিতেও পারেন না। একেবারে বোবা-কালা! বেচারার অসুখ করিয়াছে। তাহাকে লইয়া সাখি সাহেবের দরগায় যাইতেছি। বরফ পড়ার দরুণ সাখি সাহেবে যাইবার রাস্তা বন্ধ আছে। রাস্তা খুলিলেই সাখি সাহেবের দিকে আমরা রওনা হইব।

লোকটা বলিল—যত সব বাজে কথা। আমি তোমাদের এ সব কথা মোটেই বিশ্বাস করি না। চল আমার সঙ্গে কোতোয়ালিতে।

মহা মুস্কিল। রহমৎ খাঁ অনুনয় করিয়া বলিল—বেচারা মুসাফিরদিগকে কেন বৃথা হয়রাণ করেন? আমার ভাইটি শীতে একেবারে কাবু, হাঁটিতে পারে না।

লোকটা এই অনুনয়-বিনয়ে টলিবার লক্ষণ মাত্র দেখাইল না। তখন রহমৎ খাঁ শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—তবে আসুন, চলুন আপনার সঙ্গে কোতোয়ালিতেই যাই। আমাকে দেখাইয়া বলিল—ইনি অসুস্থ, ইনি যাইতে পারিবেন না।

আমার শক্ত কথায় কনেষ্টবলটা একটু নরম হইল। বলিল—আচ্ছা যাক; ইনি অসুস্থ না হইতেন তবে আমি তোমাদের দু'জনকেই আজ কোতোয়ালিতে লইয়া যাইতাম। ইনি এখন অসুস্থ, তার উপর তোমরা মুসাফির, তোমাদিগকে

আজকার মত ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু যত শীঘ্র পার এখান হইতে সরিয়া পড়।

রহমৎ খাঁ বলিল—আমরা ত চলিয়া যাইতেই সব সময় প্রস্তুত। রাস্তাটা পরিষ্কার হইলেই হয়।

কনেষ্টবল—আচ্ছা, তোমরা এখন আরাম কর। আজ বেজায় ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। আমাকে চা খাইবার জন্য কিছু আজ দাও দেখি।

রহমৎ খাঁ তাহার হাতে দশ টাকার একখানি আফগানি নোট গুঁজিয়া দিতেই লোকটা তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল।

কিন্তু তবুও কি নিস্তার আছে। তৃতীয় দিনে আবার সে আসিয়া হাজির। সে সময় আমি একাই ছিলাম। সে পুস্তুতে কিছু কথা বলিল। আমি বোবা-কালার মত অঙ্গভঙ্গি করিলাম। রহমৎ খাঁ কয়েক মিনিট পরেই ফিরিয়া আসিল। এবার সি, আই, ডি'র লোকটা বেশ সদয়ভাব দেখাইল। রহমৎ খাঁকে সে বলিল—কি হে খান, সাখি সাহেবে যাওয়ার বাস এখনও কি মিলিল না?

রহমৎ খাঁ—পাইলে কি আর এখানে বসিয়া থাকি?

সি আই ডি—এই মাত্র আমি বাসের ষ্ট্যাণ্ড হইতে আসিতেছি।

শূয়োরটাকে পাঁচ টাকার একখানি নোট দিলে সে বিদায় লইল। লোকটা চলিয়া গেলে আমি রহমৎকে বলিলাম—যত শীঘ্র সম্ভব লোকটার হাত হইতে রেহাই পাওয়

দরকার। লোকটার খাঁকতি বড়ই বেশী। কতকাল আর তাহাকে এই ভাবে টাকা দিব?

রহমৎ খাঁ—লোকটার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় অন্য কোন সরাইতে সরিয়া পড়া।

আমি বলিলাম—যদি সেখানেও সি আই ডি কুকুর আমাদের পিছন লয়, তখন কি উপায় হইবে?

রহমৎ খাঁ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলনা। তখন আমি তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম।

রহমৎ খাঁ আগেই আপনার কথা আমার কাছে বলিয়াছে। আমি মনে করিলাম আপনি হয়ত আমাকে সাহায্য করিতে পারিবেন। আপনার দোকান খুঁজিয়া বাহির করিতে আমাদের দুই দিন সময় লাগিল। তবুও রহমৎ খাঁ আপনার নিকট আসিতে চাহিল না। সে বলিল, আমি একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি, অথচ আগে কোনই ব্যবস্থা করি নাই, একথা শুনিলে তিনি আমাকে কি বলিবেন?

আমি রাগিয়া গেলাম। বলিলাম, তুমি কি চাও যে আমরা এখানে গ্রেফ্‌তার হই? উত্তমচাঁদ সহরে আছেন কিনা অন্ততঃ তাহা ত জানিয়া আসিতে পার।

আবার সি, আই, ডি

পরদিন আমরা প্রাতঃভোজন করিতেছি এমন সময় সি আই ডি'র সেই লোকটা আসিয়া সোজা বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিল—সাখি সাহেবে যাইতে তোমরা এত দেরী করিতেছ কেন ?

রহমৎ খাঁ বলিল—জায়গাটা এমন কাছে নয় যে হাঁটিয়া যাইব। বাস পাইবার উপায় নাই, কি করি ?

লোকটা চেঁচাইয়া বলিল—শুধু তোমরাই বাস পাও না, এ কেমন কথা ? কাল বিকালে তোমাদের এখান হইতে চলিয়া যাইবার পর আবদুল রহমন সরাইর কাছে লরী ষ্ট্যাণ্ডে আমি গিয়াছিলাম। শুনিলাম বাস ত ঠিক মত যাইতেছেই অধিকন্তু রীতিমত সপ্তাহে দুইবার করিয়া ডাক গাঁড়ীও যাইতেছে।

রহমৎ খাঁ প্রতিবাদ করিয়া বলিল—আমিও ত রোজ খোঁজ করি। বাস যায় এ কথা ত কারো কাছে আমি শুনি নাই। তবে আমি ডাক-গাড়ীর কোন খোঁজ করি নাই। ডাক-গাড়ীর কথা আমি জানি না। আজ আরেক-বার চেষ্টা করিয়া দেখিব যদি কোন বাস বা ডাক-গাড়ী পাই, তখনই চলিয়া যাইব।

কনেষ্টবল—খান, তোমাদের দুই জনের উপরেই আমার সন্দেহ হইতেছে। আমার মনে হয় তোমরা মনমদ সম্প্রদায়ের

লোক। (এই সম্প্রদায় আফগানিস্থানের একটি বিদ্রোহী সম্প্রদায়)। আজ আমি দারোগা সাহেবের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধে কথা বলিয়াছিলাম। তিনি আমাকে তোমাদের দুই জনকেই থানায় লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। চটপট করিয়া চা খাইয়া লও, তারপর চল আমার সঙ্গে থানায়।

বুঝিলাম, লোকটা আমাদিগকে পিষিয়া আরও কিছু টাকা আদায়ের ফিকিরে আছে। এ কয়দিন লোকটা নিজে চা খাইবার নাম করিয়া টাকা লইত। এখন আরো বেশী টাকা আদায় করিবার জন্য দারোগার নাম করিতেছে। রহমৎ খাঁ বলিল—আমরা মুসাফির, খাঁটী মুসলমান ; তুমি যদি আমাদিগকে এই ভাবে হয়রাণ করিতেই চাও তাহা হইলে খাওয়া শেষ করিয়াই তোমার সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু আমার ভাইটির ত যাওয়ার কোন উপায় নাই।

জানোয়ারটা রুক্ষ ভাষায় জবাব দিল—তাহা চলিবে না। তোমাদের দুজনকেই থানায় এক সঙ্গে লইয়া যাইব। তোমার সঙ্গী বোবা-কালা হইতে পারেন কিন্তু পা যখন আছে তখন হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন।

রহমৎ খাঁ পাঁচ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া বলিল—আমি যখন তোমার সঙ্গে যাইতেছি, তখন এ বেচারাকে হয়রাণ করা কেন?

কনেষ্টবলটা নোটখানি পকেটে পুরিল। বলিল—পাঁচ টাকায় আমাকে তুমি কিনিতে পারিবে না। দারোগা

সাহেবের হুকুম আমি খেলাপ করিতে পারি না। কিছুতেই তাহা করিতে পারিব না।

রহমৎ খাঁ আরও একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিল। তবু বদমাইসটা বলিল—অত কমে চলিবে না। শেষ কালে সতেরো টাকায় রফা হইল।

[আফগানিস্থানে কনেষ্টবলের বেতন মাসে ৩০ আফগানী টাকা। উহা ভারতের ৫ টাকার সমান।]

লোকটা বলিল—আচ্ছা, আজ আর তোমাদিগকে বিরক্ত করিব না; কিন্তু কাল তোমাদিগের এখান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে। কাল যদি তোমাদের এখানে দেখিতে পাই তাহা হইলে দুজনকেই দারোগা সাহেবের নিকট না লইয়া ছাড়িব না।

গরীব মুসাফিরদের প্রতি এই দয়ার জন্য রহমৎ খাঁ তাহাকে লম্বা সেলাম দিয়া ও ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল—বাসের খোঁজে আমি এখনই যাইতেছি, যদি পাই তাহা হইলে ঠিক আজই চলিয়া যাইব।

কিন্তু লোকটার খাঁই তখনও মিটিল না। রহমৎ খাঁর হাতে আমার হাত ঘড়িটা ছিল। সেটির উপর তাহার নজর পড়িল। বলিল—ঘড়িটা খুব দামী মনে হইতেছে। ইহার দাম কত?

রহমৎ খাঁ বলিল—না, তেমন বেশী দামী নহে।

লোকটা বলিল—পয়সাকড়ি ত বাপু তেমন বিশেষ কিছু দাও নাই, আর ঘড়িটাও যখন খুব দামী নয়, তখন ওটাই আমাকে দিয়া দাও।

রেহাই পাইবার কোন উপায় নাই। রহমৎ খাঁ ঘড়িটা তাহাকে খুলিয়া দিল।

কনেষ্টবলটা চলিয়া যাওয়ার পর আমি রহমৎ খাঁকে আপনার কাছে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। সে তুই তুইবার আপনার এখানে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আপনার দোকান তখন বন্ধ ছিল। কাল সারাটা দিন ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়াছি। আজ সকালে রহমৎ খাঁ আপনার দোকানের দিকে রওনা হইবে এমন সময় সেই ভয়ঙ্কর লোকটা আবার আসিয়া হাজির হইয়া বলিল—ওহে খান, কাল যে ঘড়িটা দিয়েছিলে দারোগা সাহেব সেটাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ঘড়িটা কোথায় পাইয়াছ? আমি বলিলাম, ঘড়িটা আমার ভাইয়ের। দারোগা সাহেব সে কথা বিশ্বাস কিছুতেই করিলেন না। আমি একই কথা বারবার বলিতে লাগিলাম। দারোগা সাহেব তোমাদের তুজনকেই বেশ সন্দেহ করিয়াছেন। আমি দারোগা সাহেবকে বলিয়াছি যে, তোমরা সরাই হইতে চলিয়া গিয়াছ। ঘড়িটা সত্যই বড় সুন্দর ছিল। দাম পড়িয়াছিল কত?

রহমৎ খাঁ—দাম এখন মনে নাই, তবে ঘড়িটা ভালই ছিল। তুমি দারোগাকে ঘড়িটা দিলে কেন?

কনেষ্টবলটি দারোগার উদ্দেশ্যে এক চোট গালাগালি করিয়া বলিল—ঠিক কথা। আমি এখনই যাইয়া ঘড়িটা আদায় করিয়া লইতেছি। আজ আমার হাতে একটি পয়সাও নাই। পাঁচটা টাকা ধার দিতে পার? কালই ফেরৎ দিব।

রহমৎ খাঁ ভাল করিয়াই জানিত টাকা আর ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। সে আস্তে আস্তে একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। মনে করিলাম—যাক আজ খুব কমেই বাঁচা গেল।

কনেষ্টবলটা চলিয়া যাইবার পর রহমৎ খাঁ চৌকিদারের কাছে গেল। বলিল—এ লোকটা আমাদের বড়ই হয়রাণ করিতেছে। আমরা অন্য কোন সরাইতে যাইয়া ঘর লইতেছি।

চৌকিদার বলিল—লোকটা শূয়রের বাচ্চা। পাঁচ দিন যাবৎ লোকটাকে আমি লক্ষ্য করিতেছি। এই মাত্র আমি লোকটাকে ভাল করিয়া শাসাইয়া দিয়াছি। বোধ হয় ভয়ে আর এদিকে আসিবে না।

ইহার পর রহমৎ খাঁ আপনার কাছে আসিল। তারপর ত আপনি সবই জানেন।

সুভাষবাবু তাঁহার কথা শেষ করিলেন।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ মূর্ত্তি

অমরনাথ সরাই হইতে মালপত্র লইয়া আসিল। আমরা আহার শেষ করিলাম এবং তারপর বসিয়া বসিয়া রেডিও শুনিতে লাগিলাম। সুভাষবাবু গত দুই সপ্তাহের বিভিন্ন রণক্ষেত্রের এবং ভারতবর্ষের খবর সংক্ষেপে জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। সুভাষবাবু বলিলেন যে, ১৯শে জানুয়ারীর পর তিনি কোনও রকমের সংবাদই শোনেন নাই।

আমার যতটা মনে ছিল ততটা খবরাখবর তাঁহাকে শুনাইলাম। তারপর বলিলাম—আমি ব্রিটিশ দূতাবাস হইতে 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' আনাইয়া পাঠ করি; কাল সকালে আপনাকে দুই সপ্তাহের এই কাগজ আনাইয়া দিব। হরিদ্বারে এক সাধুর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে যে সংবাদ বেতারে প্রচারিত হইয়াছিল সে সংবাদ এবং সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং কবিশের সুভাষবাবুর সংসার-ত্যাগ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমি বলিলাম।

শুনিয়া সুভাষবাবু খুবই কৌতুক উপভোগ করিলেন।

সে রাত্রে সুভাষবাবুকে আর কোনও প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করা উচিত মনে করিলাম না। রাত্রিও অনেক হইয়া গিয়াছিল। আমরা শয়ন করিতে গেলাম।

আমার শয়ন কক্ষে যাইয়া দেখি আমার স্ত্রী তখনও আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—এখনও ঘুমাও নাই যে?

গৃহিণী বলিলেন—ঘুমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঘুম আসে নাই। আমার বাড়ীতে দুইজন রহস্যজনক লোক রহিয়াছে, আর আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইব, ইহা তুমি কি করিয়া আশা করিতে পার?

এই দুই ব্যক্তি কে? সে সম্বন্ধে গৃহিণী আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম—সব কথা তো তোমাকে আগেই বলিয়াছি। আর বেশী কি শুনিতে চাও?

গৃহিণী—যাহা বলিয়াছ তাহা যে কত সত্য তাহা আমি জানি। এখন বলতো, এই যে ইঁহারা ঘড়ি এবং ঘুষ দিয়া একটি কনেষ্টবলের হাত হইতে কোন রকমে রেহাই পাইয়া আসিয়াছেন, সে ব্যাপারটা কি?

আমি—তুমি বুঝি দরজার কাছে ওৎ পাতিয়া সব শুনিয়াছ। ও কিছুই নয়। উনি অনেক দিন আগের একটা গল্প বলিতেছিলেন।

গৃহিণী—ওৎ পাতিয়াই শুনিয়া থাকি বা যে কোনও রকমেই শুনিয়া থাকি, তুমি দেখিতেছি দরকার হইলে বেশ ন্যাকা সাজিয়া আমার কাছে মিথ্যার অভিনয় করিতে পার।

আমি—আচ্ছা, যখন সব কথাই নিজের কানে তুমি শুনিয়াছ তখন আর আমাকে এত প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করিতেছ কেন? আমি তোমাকে বলিয়াছি ইহারা লাগমান হইতে আসিয়াছেন। এক জনের—আহা বেচারা—বড়ই অসুখ। তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা নাই। তাঁহাকে দেখাশুনা করার জন্য অপর বন্ধুকেও ঘরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়।

গৃহিণী প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিলেন—এখন বেশ বুঝিতেছি তোমার মনে কি আছে। ঘরে দুই বিচিত্র অতিথি, রাতদিন দুয়ার বন্ধ করিয়া লুকাইয়া আছে। জানি না এরা কে। আর তুমি যখন বাড়ীতে থাকিবে না, তখন আমার বাড়ীতে আমি কোন অপরিচিত পুরুষকে এমন অবস্থায় থাকিতে দিব না। যদি ইহাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে হয় তবে অন্য কোন জায়গায় বন্দোবস্ত কর। আমার ঘরে মুসলমানদের ঠাঁই নাই। আর তুমি যদি আমার অমতে ইহাদিগকে রাখিতেই চাও তবে……।

আমি আমার হাত দিয়া স্ত্রীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—চুপ কর, চেঁচাইও না, ইঁহারা শুনিতে পাইলে কি মনে করিবেন?

স্ত্রী আমার হাত ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন—কেন চেঁচাইব না শুনি?

এতক্ষণ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি বানাইয়া যে গল্প স্ত্রীকে বলিয়াছিলাম, তাহাতেই কোন রকমে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা যাইবে। এখন স্ত্রীর মেজাজ দেখিয়া বুঝিলাম, সত্য কথা বলিয়া ফেলাই ভাল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ বিষয়ে আর ব্যবধান রাখা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। অতিথিরা হয়ত দীর্ঘকাল অবস্থান করিবেন। আর স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলিয়া বলিলে অতিথির সেবা-যত্নের সুবিধা হইবে।

আমি আদ্যোপান্ত সব খুলিয়া বলিলাম। আমার স্ত্রী অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন। বলিলেন, ইঁহারা এখানে আছেন তাহা যদি কেহ জানিতে পারে তাহা হইলে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইবে কে জানে! ইঁহাদিগকে ত গ্রেপ্তার করা হইবেই, তাহার পর আমাদিগকে কি হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে তাহা কে জানে।

আমি বলিলাম—আমরা খুব সাবধানে থাকিলে ইঁহাদিগকে কেহই গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না। আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া যদি সুভাষবাবু গ্রেপ্তার হন তাহা হইলে আমাদের কলঙ্কের আর সীমা থাকিবে না। যতদিনই তিনি আমাদের বাড়ী থাকুন না কেন, ততদিন তাহা যাহাতে কোন কাকপক্ষীও না জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা আমাদের করিতেই হইবে।

আমার স্ত্রী যেন এক মুহূর্ত্তে বদলাইয়া গেলেন; সে রুক্ষমূর্ত্তি আর নাই এবং তাঁহার গলার স্বরও কোমল

হইয়া আসিল। বলিলেন—সাধ্যমত সুভাষবাবুকে সাহায্য করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার জন্য যদি আমাকে প্রাণ দিতে হয় আমি কুণ্ঠিত হইব না। ভগবানের অপরিসীম দয়া যে, তাঁহার মত দেশপ্রেমিক আমাদের গৃহে আজ অতিথি হইয়াছেন এবং আমরা দেশসেবার এই মহান্ সুযোগ পাইলাম।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া আমি হৃদয়ে বল ও সাহস পাইলাম। সুভাষবাবুর সেবা ও যত্নের জন্য আমার স্ত্রীর নিকট আমি অতিশয় ঋণী। তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সাহসের দরুণই আমি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সুভাষবাবুকে আমার বাড়ীতে আশ্রয় দিতে পারিয়াছি। সুভাষবাবু আমাদের বাড়ীতে আটচল্লিশ দিন ছিলেন। আমার স্ত্রী সব দিক দিয়া এত সাবধানী ছিলেন যে, আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীর লোকেরাও সুভাষবাবুর অবস্থিতির কথা বিন্দুমাত্র জানিতে পারে নাই।

পরদিন প্রাতে সুভাষবাবুর সুখসুবিধার ব্যবস্থার তদ্বির করিতে করিতে আমার দোকানে যাইতে দেরী হইয়া গেল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কখন রোজ দোকানে যাই। আমি বলিলাম—এই দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে। তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সুভাষবাবু ভারী চিন্তিত হইলেন। বলিলেন—আপনার রোজ ঠিক সময়ে দোকানে যাইতেই হইবে। আমার আহারের জন্য অপেক্ষা করিলে

চলিবে না। দেরীতে দোকান খুলিলে লোকে নানা রকম সন্দেহ করিবে।

দোকানে যাইবার আগে আমি সুভাষবাবুকে 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটের' পুরাতন সংখ্যাগুলি আনাইয়া দিলাম। সেগুলি তাঁহাকে দিয়া তাঁহার ঘরে তালা বন্ধ চাবিটি আমার স্ত্রীর হাতে দিয়া দোকানে চলিয়া গেলাম"।

কলিকাতা হইতে কাবুলের পথে

সে দিন রাত্রিতে আহারের পূর্ব্বে বসিয়া বসিয়া নানা রকম কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম। সুভাষবাবুকে বলিলাম—যদি কিছু মনে না করেন, তবে কলিকাতা হইতে আপনার পলায়নের কাহিনী আপনার নিজ মুখে শুনিতে চাই।

সুভাষবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—অনেক দিন ধরিয়াই ইচ্ছা ছিল মস্কোতে যাইব, কিন্তু ব্যবস্থা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। যাঁহারা বলিয়াছিলেন আমাকে মস্কোতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তাঁহারা দুই মাস আগেই আমাকে গুপ্তভাবে ভারতের বাহিরে পাঠাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় ভারত ছাড়িয়া আসা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। প্রথমতঃ, কলিকাতা কর্পোরেশন সম্পর্কে কতকগুলি জরুরি কাজ আমার হাতে ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তখনও লম্বা দাড়ি রাখিতে পারি নাই। ছদ্মবেশের জন্য লম্বা দাড়ি খুবই কাজে লাগে। এই জন্যই

সে সময়ে আমি ভারত ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি, সে সময় যদি ভারত ত্যাগ করিতে পারিতাম, তবে কত সহজে মস্কো পৌঁছিতে পারিতাম। আমার সঙ্গে যাঁহার আসার কথা ছিল, রুশ দূতাবাসের লোকদের সঙ্গে তাঁহার খুব জানাশোনা ছিল। যখন আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতে রাজী হইলাম না, তখন তিনি একাই চলিয়া গেলেন। এখন তিনি মস্কোতে আছেন।

একখণ্ড জমি লইয়া (মহাজাতি সদন) কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত একটা ঝগড়া চলিতেছিল। সেই কলহ কোন রকমে মিটাইয়া ফেলিলাম। তখন আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং চিকিৎসকগণ আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়াছেন—এই অজুহাতে আমি বাড়ী হইতে বাহির হওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি কঠোর নির্দ্দেশ দিলাম যে, কেহ যেন আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে। যদি আমার কাছে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে সে যেন টেলিফোনে কথা বলে। কোন আগন্তুককেই আমার সম্মুখে আসিতে দিতাম না। পলায়নের কয়েক দিন আগে আমার আত্মীয়দের পর্য্যন্ত আমার ঘরে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। চাকরকেও আদেশ দিয়াছিলাম যে, সে যেন আমার খাবার ঘরের বাহিরের টেবিলের উপরে রাখিয়া চলিয়া যায়।

ইতিমধ্যে যাঁহারা আমার পলায়নের ব্যবস্থা করিতেছিলেন তাঁহাদিগের নিকট আবশ্যকীয় সব খবর পাইলাম এবং পলায়নের একটা তারিখ স্থির করিলাম। আমার দাড়ি চল্লিশ দিনের মধ্যে কামাইলাম না। ১৫ই জানুয়ারী তারিখে সমস্ত ব্যবস্থা এক রকম সম্পূর্ণ হইয়া গেল। রাত্রি ৮টার সময় মৌলবীর ছদ্মবেশে আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একটী গাড়ীতে উঠিলাম এবং সেই গাড়ীতে করিয়া চল্লিশ মাইল দূরে এক রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। (সুভাষবাবু ষ্টেশনের নামটী আমাকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা আমার মনে নাই)। ঐ ষ্টেশনে পেশোয়ারের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া ডাকগাড়ীতে উঠিলাম। সমস্ত রাত্রিটা বেশ নিরাপদেই কাটিয়া গেল। পরদিন একজন শিখ যাত্রী আমার কামরায় উঠিলেন। আমরা পরস্পর মুখামুখি হইয়া বসিলাম।

কথোপকথন প্রসঙ্গে ঐ শিখ ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথা হইতে আমি আসিয়াছি, কোথায় যাইতেছি, কি কাজে বাহির হইয়াছি। আমি বলিলাম—আমার বাড়ী লক্ষ্ণৌতে, আমার নাম জিয়াউদ্দিন। আমি একজন ইন্সিওরেন্স অর্গানাইজার, যাইতেছি রাওয়ালপিণ্ডি। ভদ্রলোক সারা দিন আমার সঙ্গে ট্রেণে ছিলেন। কোন ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলেই আমি একখানা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢাকিয়া রাখিতাম।

আমার পরিধানে খুব আঁটাসাটা পায়জামা, একটা সেরওয়ানী এবং মাথায় একটি ফেজ ছিল। সে অবস্থায় আমাকে চিনিতে পারা যে কোন পাকা ডিটেক্‌টিভের পক্ষেও কষ্টসাধ্য। বিশেষ করিয়া আমার ঐ লম্বা দাড়ি দেখিয়া আমাকে চিনিতে পারে কার সাধ্য। আমাকে একেবারে হুবহু মৌলবীর মত দেখাইতেছিল। পথটা নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটিল। ১৭ই জানুয়ারী রাত্রি নয়টার সময় পেশোয়ারে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে আমার জন্য একখানি মোটর গাড়ী প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে মোটরে চড়িয়া সোজা একটা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম।

দুই দিন পেশোয়ারে কাটাইলাম। আমার বন্ধুগণ আমার কাবুল যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সে জন্য এ দুই দিন পেশোয়ারে অপেক্ষা করিতে হইল। আমাকে পেশোয়ারে নিরাপদ রাখিবার জন্য বন্ধুরা যে চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার আমি প্রশংসা না করিয়া পারি না। আমার পেশোয়ারে অবস্থিতির কথা কেহ বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই। ১৯শে জানুয়ারী তারিখে আমাকে পাঠানের পোষাক দেওয়া হয়। আমার বন্ধুরা মনে করিলেন যে, সংযুক্ত প্রদেশের মৌলবীর বেশ অপেক্ষা আফগানিস্থানের পাঠানের বেশই আমাকে মানাইবে ভাল। রহমৎ খাঁ এবং আর এক জন বন্ধু সহ একটি মোটরে করিয়া পেশোয়ার হইতে বাহির হইলাম এবং জামরুদের রাস্তা ধরিলাম।

জামরুদ কিল্লার কিছু দূরেই একটা কাঁচা সড়ক বাহির হইয়া অন্য দিকে গিয়াছে। আমরা সেই কাঁচা সড়ক ধরিলাম। শেষকালে গার্হী নামে একটা ছোট গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মোটরের রাস্তা সেখানেই শেষ, সুতরাং আমাদিগকে নামিতে হইল। রাত্রিটা গার্হীতেই কাটাইলাম। পরদিন রহমৎ খাঁ এবং আমি হাঁটিয়া কাবুলের দিকে রওনা হইলাম। আমাদের সঙ্গে দুই জন বন্দুকধারী পাঠান চলিল। আমাদিগকে পথিমধ্যে রক্ষা করিবার জন্য এই দুই জন পাঠানের পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা হইয়াছিল। সঙ্গে যে বন্ধুটী আসিয়াছিলেন তিনি মোটর লইয়া পেশোয়ারে ফিরিয়া গেলেন। ঠিক হইল এখন হইতে আমাকে বোবা-কালার অভিনয় করিতে হইবে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা ভারতের সীমা পার হইয়া গেলাম। ভারতের সীমারেখা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুদূর চলিয়া সীমান্তের খণ্ডজাতিসমূহের বাসভূমির একটা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই গ্রামে 'আড্ডা শরীফ' নামে একটি বিখ্যাত দরগা আছে। সেই দরগাতে একজন পীর বাস করেন। তিনি আমাদের থাকিবার সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছিলেন। পাহাড়ী বন্ধুর পথে চলিতে চলিতে আমরা মড়ার মত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। রাত্রিটা পীর সাহেবের মসজিদে কাটাইলাম।

গার্হী হইতে যে দুই জন সশস্ত্র পাঠান আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা এবার বিদায় হইল। পর দিন আমাদের সঙ্গে অপর তিন জনকে দেওয়া হইল। তাহাদের হাতেও বন্দুক ছিল। পথটা অতি দুর্গম। পথে ক্রমাগত বিশ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইল। রাত্রি নটার সময় লালপুরায় পৌঁছিলাম। এখানে আগে হইতে আমাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। রাতটা এখানে আরামেই কাটাইলাম। আমাদের অতিথি-সংকারক ছিলেন এখানকার একজন প্রতিপত্তিশালী খান; বস্তুতঃ তিনিই এখানকার শাসনকর্ত্তা। আফগান সরকারী মহলে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি আছে।

এরই মধ্যে আমি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে আশ্বাস দিয়া বলা হইল যে, আর মাত্র কয়েক মাইল গেলেই কাবুল নদের ধারে যাইয়া পৌঁছিব। কাবুল নদ পার হইতে পারিলেই মোটরের রাস্তা পাওয়া যাইবে। তারপর বাসে করিয়া কাবুলে যাইতে পারিব।

লালপুরা ছাড়িয়া যাইবার আগে আমাদের আশ্রয়দাতা একখানা পরিচয়পত্র দিলেন। যদি পথে আমাদিগকে কেহ সন্দেহ করে কিম্বা কোন রকম বিপদ ঘটে, তাহা হইলে ঐ পরিচয়-পত্র দেখাইয়া আমরা নির্ঝঞ্ঝাটে চলিতে পারিব। তিনি এ কথাও আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, যদি এই

পরিচয়-পত্র সঙ্গে থাকে আমাদিগকে আফগানিস্থানে কেহ হয়রাণ করিবে না।

আমি নিজে লালপুরার খানের দেওয়া পরিচয়-পত্রটি পাঠ করিলাম। উহা পারসিক ভাষায় লেখা ছিল। পরিচয়-পত্রে বলা হইয়াছিল, রহমৎ খাঁ এবং জিয়াউদ্দিন লালপুরা অঞ্চলের লোক, তাঁহারা সাখি সাহেবের দরগায় যাইতেছেন। আমি নিজে তাঁহাদের আচরণের জন্য জামিন থাকিয়া এই পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিলাম। কেহ যেন তাঁহাদিগকে হয়রাণ না করে কিম্বা বিপদে না ফেলে।

আমি বোসবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—যে সি, আই, ডি কনেষ্টবলটা আপনাদিগকে হয়রাণ করিতেছিল তাহাকে ঐ পরিচয়-পত্র দেখাইলেন না কেন?

সুভাষবাবু বলিলেন—দেখাইয়াছিলাম বই কি; তাহাতেই কোন রকমে আমরা তাহার কবল হইতে রেহাই পাইলাম। যেদিন ঘড়িটা দিয়া দিতে হইয়াছিল সেই দিনই ঐ পত্র দেখাইয়াছিলাম। তাহার আগে পর্য্যন্ত লোকটা আমাদিগকে পীড়ন করিতেছিল। পত্রটি দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা নরম হয়। তবে পরিচয়-পত্র দেখিবার গরজ লোকটার তত ছিল না, সে ছিল টাকা আদায়ের ফিকিরে।

বোস-বাবু বলিতে লাগিলেন—লালপুরা ছাড়িবার পর দুই জন সশস্ত্র লোক আমাদের চলনদার ছিল। কয়েক

মাইল হাঁটার পর আমরা কাবুল নদের ধারে পৌঁছিলাম। কিন্তু পার হই এমন কোন নৌকা সেখানে পাইলাম না। এখানের লোকেরা ভিস্তিওয়ালাদের কতকগুলি চামড়ার থলে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া নৌকার মত একটা কিছু তৈয়ারী করে। প্রথমে আমার উহার উপর উঠিতে ভয়ই করিতে লাগিল—কি জানি যদি ডুবিয়া যাই ; তারপর যখন দেখিলাম, সকলে কোনও প্রকার ভয় না করিয়া অনায়াসে উহার উপর উঠিতেছে, তখন আর আমি কোন ভয় করিলাম না। মাছ ধরিবার একটা জাল ভিস্তিওয়ালার থলির উপর পাতিয়া তাহার উপর বসিলাম এবং নদী পার হইলাম। এতক্ষণে আমরা আফগান অঞ্চলে পৌঁছিলাম। এখানে অস্ত্রসহ রাস্তা চলা নিষেধ। কাজেই আমাদের চলনদার দুইজনকে নদীর অপর পারে বিদায় দিতে হইল।

এ ভাবে অন্য রাস্তা দিয়া আসিয়া আমরা ডাকার ঘাঁটি এড়াইলাম। ডাকা পেশোয়ার হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। যাহারা কাবুল এবং পেশোয়ারের মধ্যে যাতায়াত করে তাহাদিগকে এখানে ছাড়পত্র দেখাইতে হয়। কেহ চুঙ্গিকর ফাঁকি দিতেছে কিনা, তাহার জন্য এখানে সকলের জিনিষপত্র খুঁজিয়া দেখা হয়। শুনিয়াছিলাম যে, শুধু পেশোয়ার এবং ডাকার মধ্যেই তিন জায়গায় এইরূপ তিনবার ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হয়। এই জন্যই এই পথটা এড়াইয়া আমরা অন্য পথ ধরিয়া-

ছিলাম। সেই পথের দুর্গম রাস্তা পার হইয়া আসিতে তিন দিন সময় বেশী লাগে।

আমরা যেখানে আসিয়া পৌঁছিলাম, সেখানে রাস্তার কাছেই একটা জায়গা আছে। সেই জায়গাটাকে লোকেরা 'ঠাণ্ডী' বলে। এখানে অনেক বড় বড় গাছের ঝাড় আছে। একটা কুয়াও আছে। বাসের অপেক্ষায় আমি গাছের তলায় শুইয়া পড়িলাম। রহমৎ খান দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলের দিকে কোন বাস দেখিলেই সে থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোন বাসই তার কথার গ্রাহ্য করিল না। অবসাদে আমার তন্দ্রা পাইল। ঝিমাইতে ঝিমাইতে অনেক রাত হইয়া পড়িল। হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন সময় হঠাৎ রহমৎ খাঁ আমাকে জাগাইল। দেখিলাম আমার কাছে একটা লরী দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে কোন ক্রমে এই লরীর উপর উঠিতে হইবে। কি করিয়া যে উঠিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অনেক বাক্সে ও মালপত্রে লরীটা একেবারে ভর্ত্তি। বসিবার কোন জায়গাই নাই। লরীর চালক চীৎকার করিয়া বলিল—বাক্সের উপর উঠিয়া বস না কেন? কি আর করিব, উঠিয়া বাক্সের উপরই কোন রকমে বসিলাম। শীতের রাত, চারিদিকে অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে। চলিয়াছি একটা উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়া। এই দারুণ শীতের মধ্যে আত্মরক্ষা করার মত গরম কাপড় আমার কোথায়?

চক্ষু খুলিয়া রাখা পর্য্যন্ত কষ্টদায়ক। লরীর উপর উঁচু জায়গায় বসিয়া রহিয়াছি, রাস্তার দুই ধারে গাছ ও ডালের ধাক্কা লাগিয়া কখন পড়িয়া যাই সেই ভয়ে সন্ত্রস্ত। ডালের ধাক্কা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্রমাগত মাথা নোয়াইয়া নোয়াইয়া সমস্ত পথ চলিয়াছি। কি দুর্ভোগের রাত। রহমৎ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কি কোন ভাল গাড়ী পাওয়া গেল না?

রহমৎ খাঁ বলিল—খুব কম পনরটা লরীকে থামিবার জন্য হাতছানি দিয়াছি। এক ব্যাটাও থামে নাই। কেবল এই লরীটী দয়া করিয়া থামিয়াছে। যদি এটার উপর না উঠিতাম, তাহা হইলে রাত্রিতে আর একটা লরীও পাইতাম না; ঐ ঠাণ্ডাতেই বোধ হয় রাস্তায় বরফে জমিয়া যাইতাম। এই রকম ভাবে সমস্তটা রাত বাসেই কাটাইতে হইল। পথে কয়েকবার চা খাইতে হইল। গরম থাকিবার জন্যই উহা করিতে হইল।

পরদিন আমরা বাটঘাকে পৌঁছিলাম। এখানে ছাড়পত্র দেখা হয় এবং ঘুষও লওয়া হয়। আমরা কি উদ্দেশে চলিতেছি তাহা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল। রহমৎ খাঁ আমার দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ইনি আমার বড় ভাই, বোবা-কালা। আমি ইহাকে সাখি সাহেবের দরগায় লইয়া যাইতেছি। স্বাধীন পার্ব্বত্য অঞ্চলে আমাদের বাস।

সে লালপুরার খানের দেওয়া পরিচয়-পত্রটি দেখাইল। উহা দেখিয়া প্রশ্নকর্ত্তা একেবারে চুপ হইয়া গেলেন।

চা খাইয়া আবার লরীতে উঠিলাম। বিকাল চারিটা পাঁচটার মধ্যে কাবুলে পৌঁছিলাম। পেশোয়ার হইতেই আফগানী টাকা ও নোট লইয়া আসিয়াছিলাম। লরীওয়ালার ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। তারপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা কালই আমার মুখে শুনিয়াছেন। ইহা বলিয়া সুভাষবাবু তাঁহার কথা শেষ করিলেন। ঠিক এই সময় আমার ছোট মেয়ে খাবার লইয়া আসিল। আমরা রেডিও শুনিতে শুনিতে খাইতে লাগিলাম।

রেডিও শোনা শেষ হইলে আমি বলিলাম—রহমৎ খাঁ আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনি এখানকার ইতালীয়দের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছেন। তবে কি আপনি আর মস্কো যাইতে চাহেন না? যদি মস্কো যাওয়ার ইচ্ছাই থাকে, তবে ইতালীয়দিগের শরণ লইলেন কেন?

সুভাষবাবু—মস্কো যাওয়ার ইচ্ছা আমি ছাড়ি নাই। বাধ্য হইয়াই ইতালীয়দিগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছি। আমার বন্ধুরা আমাদের কাবুল আসা পর্য্যন্তই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু কাবুলে আমাদের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কাবুলের কিছুই আমি জানি না, রহমৎ খাঁও তথৈবচ। সে পুস্তু জানে বটে, কিন্তু কাবুলে তাহা কোন কাজেই লাগে না।

যাঁহারা তাহাকে আমার সহিত পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এখানে রাশিয়ানদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনে আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না। দেখা যাইতেছে যে, এখানকার দূতাবাসে যে কেহ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, এ কথাও তাঁহাদের জানা ছিল না। এ দূতাবাসের দুয়ার সব সময় বন্ধ থাকে, আফগান পুলিশ রাতদিন দাঁড়াইয়া পাহারা দেয়। আমার বন্ধুদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, আমার নাম এবং আমি যে এখানে আসিয়াছি এ কথা রুশদূতের নিকট বলামাত্রই তিনি আমাকে মস্কো যাইবার জন্য একখানি বিমানের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

যে দিন আমরা কাবুলে আসিয়া পৌঁছি তাহার পরদিনই রুশ দূতাবাসের খোঁজে বাহির হই। বলা বাহুল্য, রুশ দূতাবাস কোথায় তাহা আমরা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই। আমরা সহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইতালীয়ান, ইজিপ্সিয়ান, ইরাণীয়ান, এবং গ্রীক দূতাবাসগুলি দেখিতে পাইলাম এবং দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, সর্ব্বত্রই আফগান পুলিশ দ্বারদেশে কড়া পাহারা দিতেছে। ইউরোপের কোথাও কিন্তু এরূপ প্রথা দেখি নাই। অধিকন্তু এখানকার প্রহরীরা যে কেহ দূতাবাসে প্রবেশ করিতে যায়, তাহারই পরিচয় জানিতে চাহে। ইউরোপে যে কোন দূতাবাসে সোজা ঢুকিয়া যাও, কেহ তোমাকে থামাইবে না।

রুশ দূতাবাস খুঁজিয়া পাইলাম না। আর হাঁটিতেও পারিতেছিলাম না। একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পেশোয়ারী চপ্পল পরিয়া বরফের উপর দিয়া হাঁটিতে বড়ই কষ্টবোধ হইতেছিল। সরাইতে ফিরিয়া আসিলাম। শরীর ও মন দুইই ক্লান্ত। তাই রাত্রিতে মড়ার মত ঘুমাইলাম।

অনেক বেলা হইয়া গেলে ঘুম ভাঙ্গিল। প্রাতরাশ শেষ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম রুশ দূতাবাসের খোঁজে। যে অঞ্চলে অন্যান্য দূতাবাসগুলি রহিয়াছে যে অঞ্চলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইলাম কিন্তু সোভিয়েট দূতাবাসের খোঁজ পাইলাম না। তাহার পর সহরের অন্যান্য অঞ্চলে খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দেখিলাম, একটা বাড়ীর উপর লাল ঝাণ্ডা (Red flag) উড়িতেছে। নিশ্চিত বুঝিলাম যে উহাই রুশ দূতাবাস। বাড়ীটির দুয়ার বন্ধ। যথারীতি আফগান পুলিশ দুয়ারে কড়া পাহারা দিতেছে। বাড়ীটির কিছু দূরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এখন কি করা যায়। পরিচয় না দিয়া দূতাবাসে প্রবেশ করা অসম্ভব। তার উপর আমরা যে রকম পোষাক পরিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে যে দূতাবাসে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা আমরা স্পষ্ট ধরিয়াই লইয়াছিলাম। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, নিজেকে এবং যাঁহারা আমার পলায়নের

ব্যবস্থা করিয়াছিল তাঁহাদিগকে মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এমন ভাবে এই অব্যবস্থার মধ্যে আমাকে এখানে পাঠানো আমার বন্ধুদের পক্ষে অতি অন্যায় কাজ হইয়াছিল। নানারকম বিপদ এড়াইয়া এত দূর আসিয়া কি সবই বিফল হইবে? অন্ততঃ এমন এক জন লোক আমার সঙ্গে দেওয়া উচিত ছিল, যাহার সহিত আগে হইতেই রুশ দূতাবাসের লোকদের জানাশোনা ছিল, অথবা কি করিয়া রুশ দূতাবাসের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, তাহার হদিশ জানা ছিল। ক্ষুণ্ণ মনে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার সরাইতে ফিরিয়া আসিলাম, মনের দুঃশ্চিন্তায় ক্ষুধা পর্য্যন্ত পাইল না।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া অতঃপর কি করা যায় সে কথার আলোচনা করিলাম। অবশেষে একটা ফন্দি বাহির করিলাম। পর দিন আমরা রুশ দূতাবাসের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিব, যদি কখনও রুশ দূতের গাড়ী বাহিরে আসে তবে আমরা উহা কোন রকমে থামাইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিব। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আর অন্য কোনও উপায় ছিল না।

তার পরদিন আবার বাহির হইলাম সোভিয়েট দূতাবাসের দিকে। কয়েকখানি গাড়ী ভিতরে ঢুকিল ও কয়েকখানি গাড়ী বাহির হইয়া গেল। কিন্তু কোনও গাড়ীর মধ্যে কোন রুশ আরোহী ছিল কিনা, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম

না। তখন বিকাল সাড়ে চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। আবার হতাশ হইয়া উঠিয়া আসিবার উপক্রম করিলাম। অকস্মাৎ দূতাবাসের দুয়ার খুলিয়া গেল। ছোট্ট একটি লালঝাণ্ডা উড়াইয়া একটি গাড়ী বাহির হইয়া আসিল। গাড়ীর আরোহীকে দেখিয়া মনে হইল তিনি নিশ্চয় রাশিয়ার দূত হইবেন। কেন না, গত তিন দিনে জানিতে পারিয়াছি যে একমাত্র রাষ্ট্রদূতদের গাড়ীতেই যার যার নিজ দেশের পতাকা উড়ান থাকে। গাড়ীখানি যখন আমাদের পাশ দিয়া যাইতেছিল তখন রহমৎ খাঁ হাতছানি দিল, গাড়ীখানি থামিয়া গেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা পারসীতে রহমৎ খাঁ গাড়ীর পিছনের আসনে উপবিষ্ট আরোহীর কাছে আমার সম্বন্ধে কি একটা কথা বলিল। আমি গাড়ী হইতে একটু দূরে ছিলাম। আমি দেখিলাম রহমৎ খাঁ আমাকে দেখাইয়া কি বলিতেছে।

তারপর আরোহীর সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা রহমৎ খাঁ আসিয়া আমাকে জানাইল। রহমৎ খাঁ রুশ দূতকে বলিয়াছিল সে সুভাষচন্দ্র বসুকে কাবুলে লইয়া আসিয়াছে। তিনি মস্কোতে যাইতে চাহেন। এ বিষয়ে রুশ দূত তাঁহাকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারেন কিনা। রুশ দূত জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায়? রহমৎ খাঁ আঙ্গুল দিয়া আমাকে দেখাইয়া দেয়। রুশ দূত বলেন—ইনিই যে সুভাষচন্দ্র বসু, তাহা আমি নিঃসন্দেহে কি করিয়া জানিব? তাঁহার পরিচয়ের কোন প্রমাণ না পাইলে আমি কি করিয়া

সাহায্য করি? তিনি রহমৎ খাঁর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রহমৎ খাঁ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রহমৎ খাঁর কথা শুনিয়া বড়ই আমি মুষড়িয়া গেলাম। মস্ত বড় একটা সুযোগ হাত ছাড়া হইয়া গেল। ভাষার অসুবিধার দরুণই রহমৎ খাঁ সঙ্গে সঙ্গে রুশ দূতের প্রশ্নের জবাব দিতে পারিল না। এখানেই ছিল আমাদের আয়োজনের ত্রুটি।

নিরুপায় হইয়া সরাইয়ে ফিরিয়া আসিলাম। রহমৎ খাঁ বলিল, পেশোয়ারে খবর পাঠান যাক। আমাদের বন্ধুরা হয়ত আমাদের অবস্থার কথা শুনিয়া রাশিয়ানদের সহিত পরিচয় আছে এমন কোন লোককে পাঠাইবেন। কিন্তু পেশোয়ারে আমাদের খবর লইয়া যাইতে পারে এমন বিশ্বাসযোগ্য লোক কোথায় পাওয়া যাইবে?

আমি বলিলাম—যদি তাঁহারা খবর পানও তাহা হইলেই বা কি করিতে পারিবেন? যদি তাঁহারা কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আগে হইতেই নিশ্চয় ব্যবস্থা করিতেন। আমাদিগকে এই অচল অবস্থায় ফেলিতেন না।

যাহা হউক, একজন লরী ড্রাইভারের মারফৎ আমরা পেশোয়ারে একজন সহকর্ম্মীর নিকট খবর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

পরদিন রহমৎ খাঁ একখানি পত্র লইয়া লরী ড্রাইভারের কাছে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সে খবর

দিল যে, একজন বিশ্বস্ত লরী ড্রাইভারের মরফৎ পত্রটি পেশোয়ারে পাঠাইয়া দিয়া আসিয়াছে। ঐ যে সি আই ডি কনেষ্টবলটার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেদিনই রহমৎ খাঁ আমার কাছে তাঁহার কথা বলিয়াছিল। জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া আসিতেছিল, তাহার উপর আবার এই উপদ্রব।

ইতালীয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ

পেশোয়ার হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্বন্ধে যখন বিস্তর সন্দেহ আছে, তখন চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া লাভ কি। ভাবিলাম, দেখি নিজেরা কতদূর কি করিতে পারি। পেশোয়ারে খবর পাঠাইয়াছি বটে কিন্তু উত্তর কবে আসিবে তাহা কে জানে। রাশিয়ানরা ত এক প্রকার না-ই বলিয়া দিয়াছে। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না যে, তাহারা আদৌ আমাকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক কিনা অথবা আমার পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নহে বলিয়াই আমাকে সাহায্য করিতে রাজী হইতেছে না। এ অবস্থায় ইতালীয় দূতাবাসের সঙ্গে কথাবার্ত্তার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি ইতিমধ্যে আমার পেশোয়ারের বন্ধুরা যদি আমার মস্কো যাওয়ার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে ত ভালই! আর যদি কোন ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে আমার মনে হইল যে, ইতালীয়রা আমাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইবে না এবং আমি খুব শীঘ্রই তাহাদের সাহায্যে এখান হইতে

চলিয়া যাইতে পারিব। জার্ম্মাণ দূতাবাসে এখন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখি নাই। তার উপর খোঁজাখুঁজি করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ ইহাতে বেশী জানাজানি হইয়া যাইতে পারে। ইতালীয় দূতাবাস কোথায় তাহা আগেই দেখিয়া আসিয়াছি। সব দূতাবাসের এই ব্যবস্থা। সব জায়গায়ই দূতাবাসে প্রবেশ করিয়া সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে আমার কথা জানাইতে হইবে। আমার বিশ্বাস যে, তাহা করিতে পারিলেই যে-কোন দূতাবাসের লোক আমার কাবুলে অবস্থিতির কথাটা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন এবং আমাকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইবেন না। আর এখন এখান হইতে ইউরোপ যাইবার একটি মাত্র পথ রহিয়াছে—তাহা হইতেছে মস্কোর পথ। হয় আমি মস্কো নামিব, না হয় বার্লিন বা রোমে রুশ দূতের সহিত ব্যবস্থা করিয়া মস্কোতে ফিরিয়া আসিব।

বোসবাবু বলিতে লাগিলেন—সে রাতটা আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা করা যায় তাহার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম। রহমৎ খাঁ স্বীকার করিল যে, আমার পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব এদেশ ছাড়িয়া যাওয়াই মঙ্গল। পরদিন রহমৎ খাঁ ইতালীর দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করিতে গেল। দুয়ারে পৌঁছিতেই আফগান পুলিশ তাহাকে বাধা দিল। রহমৎ খাঁ বলিল, সে জাপানী দূতাবাসের একজন চৌকিদার। এই ফন্দী করিয়া সে

দূতাবাসে ঢুকিল। এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিল সেনর কারোনি। রহমৎ খাঁ তাহার কাছে আমার সম্বন্ধে সব কথা খুলিয়া বলিল। আমি কাবুলে উপস্থিত হইয়াছি এ কথা শুনিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইলেন এবং রহমৎ খাঁকে বলিলেন—আমি আজই রোম ও বার্লিনে খবর পাঠাইয়া দিতেছি। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করিতেছি। যত শীঘ্র পারা যায় আমরা সুভাষচন্দ্রকে এদেশ হইতে সরাইয়া লইতেছি। ইহার পর খবরা-খবরের জন্য সেনর কারোনি কাবুলস্থ হের টমাস নামক জনৈক জার্ম্মাণের বাড়ীতে একটা স্থান ঠিক করিলেন। রহমৎ খাঁ তাহাকে দূতাবাসে যাতায়াতের অসুবিধার কথা এবং যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায় এরূপ একটা স্থান ঠিক করার কথা বলিয়াছিল। রহমৎ খাঁ যখন চলিয়া আসিবে সেই সময় সেনর কারোনি বলিলেন—তুই দিনের মধ্যেই বার্লিন ও রোম হইতে খবর পাইব বলিয়া আশা করি। আজ হইতে তিন দিনের দিন হের টমাসের সহিত দেখা করিবেন। সেখানে একখানা বন্ধ করা এনভেলাপ রাখিয়া আসিব।

হের টমাস একজন জার্ম্মাণ। তিনি কতকগুলি জার্ম্মাণ ফার্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপ আফগানিস্থানে ছিলেন। সব-রকমের কারবারই তিনি করিতেন। কাজেই যে কোন লোক তাঁহার অফিসে যাতায়াত করিতে পারিত। কেহই কাহাকেও সন্দেহ করিত না। বস্তুতঃ, সে সময় যে সমস্ত

জার্ম্মাণ আফগানিস্থানে ছিল, তাহারা সকলেই ছিল কুটচক্রী। কারবার করা একটা ছল মাত্র। কারবারের নামে তাহারা রাজনৈতিক কাজ করিয়া বেড়াইত।

ইতালীয়ানদের সাহায্য পাইব, রহমৎ খাঁর নিকট হইতে এ কথা শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। মনের ভার অনেকটা লাঘব হইল। তবে বার্লিন ও রোমে যাওয়ার আমার তেমন মন ছিল না। কি করিব, অন্য কোন উপায় নাই।

তারপর বোসবাবু বলিলেন—আপনি ত অনেক কাল এখানে আছেন। রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যদি আপনার জানাশোনা থাকে তবে রুশ দূতের সহিত আমাকে একবার দেখা করাইয়া দিতে চেষ্টা করুন না কেন?

আমি বলিলাম—অনেক কাল কাবুলে আছি, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু সোভিয়েট দূতাবাসের কাহাকেও আমি জানি না। কাবুলে আসিয়া কোন রাজনৈতিক কার্য্য করিবার অভিপ্রায় আমার কোন দিন ছিল না। আরও শুনিয়াছিলাম যে, রুশ দূতবাসের লোকগুলি বড়ই সন্দেহপরায়ণ। তবে আপনি যখন বলিতেছেন, আমি তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করিয়া নিশ্চয় দেখিব।

সুভাষবাবু—দয়া করিয়া তাই করুন। ইতালীয়ানদের সহিত সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া যাওয়ার পরও যদি রাশিয়ানরা আমাকে আশ্রয় দিতে রাজী হয়, তাহা হইলে আমি আমার ব্যবস্থা বদল করিব।

নির্দ্ধারিত দিবসে রহমৎ খাঁ হের টমাসের কাছে গেল। তিনি তাহাকে একখানা এনভেলাপ দিলেন। সে এনভেলাপের ভিতরকার চিঠিতে লেখা ছিল—

যে দিন আপনার চিঠি পাই, সে দিনই এখানে আপনার উপস্থিতির কথা বার্লিন ও রোমে জানাইয়া দিই। সেখানকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই সংবাদে খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। আপনার বিচিত্র পলায়নে তাঁহারা আপনাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছেন। আপনাকে সাহায্য করিবার আদেশ আমাকে দেওয়া হইয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া যাইবে।

ইতি ভবদীয়—কারোনি

পরদিন আমি নিম্নলিখিত উত্তর লিখিয়া হের টমাসের মারফৎ সেনর কারোনিকে পাঠাইয়া দিলাম —

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনি আমার জন্য যে ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করিতেছেন তাহার জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ জানাইতেছি। যত সত্বর সে ব্যবস্থা হয় ততই সব দিক দিয়া ভাল। কেননা, এরূপ বেশী দিন জায়গায় থাকা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। বার্লিন এবং রোমে কর্তৃস্থানীয় যাহারা আমাকে শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন, আমার হইয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইবেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী রহমৎ খাঁ আমাকে বলিলেন—আজ আমিও আপনার সঙ্গে বাজারে যাইব। দিনরাত বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগে না। হের টমাসের কাছে একবার যাইয়া দেখিতে হইবে আমাদের জন্য কোন খবর আসিয়াছে কিনা।

কিন্তু সুভাষবাবু তাহা অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন—উহা মোটেই নিরাপদ নহে। উত্তমচাঁদ বরং হের টমাসের কাছে যাইয়া দেখুন, আমাদের জন্য কোন খবর আছে কি না। তাহা হইলেই আমরা জানিতে পারিব।

আমিও রহমৎ খাঁকে বাহির হইতে নিষেধ করিলাম। বলিলাম—যে সি, আই, ডি-টার দৃষ্টি এড়াইয়া আসিয়াছেন, সে যদি আবার আপনাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে কি হইবে? আমি যাইয়া হের টমাসের সহিত দেখা করিতে পারি।

আমি নিজে একজন রেডিও বিক্রেতা। আমার জানা ছিল যে, কাবুলে একজন জার্ম্মাণের দোকান আছে, যেখানে রেডিওসেট বিক্রয় হয়। কিন্তু সেটাই যে হের টমাসের দোকান তাহা জানিতাম না। হের টমাসের ঠিকানা বাহির করিলাম। তারপর সুভাষবাবুকে বলিলাম, হের টমাসের বাড়ীতে যাওয়া-আসা করায় লাভ কি? আমার দোকানেই ত খবরা-খবরের লেন-দেন হইতে পারে। তাহাতে হাঙ্গামাও কমিবে, বিপদের বিশেষ আশঙ্কাও

থাকিবে না। ঘনঘন হের টমাসের দোকানে যাইলে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে।

সুভাষবাবু আমাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন—কথাটা ঠিকই। রহমৎ খাঁ আমাকে বলিয়াছে হের টমাসের মোটর চালক একজন ভারতীয়। লোকটা ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্ম্মচারী। রহমৎ খাঁ যখনই হের টমাসের দোকানে যায়, তখনই লোকটা তাহার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

আমি বলিলাম—আমাকে কেহ সন্দেহ করিবে না, কেননা কাবুলের সকলেই জানে যে, আমি রেডিও সেটের কারবার করি।

তারপর সুভাষবাবু সেনোরা কারোনিকে একখানি পত্র লিখলেন। এবং তাহা হের টমাসকে দিবার জন্য আমার হাতে দিলেন। পত্রটির বিষয়বস্তু হইতেছে এই —

"সরাইতে থাকাকালে বিপদের গন্ধ পাইয়া আমরা এক বন্ধুর বাড়ীতে সরিয়া আসিয়াছি। নদীর ধারে একটা নূতন বাড়ীতে। তাঁহার তৈজসপত্র ও রেডিও সেটের একটা দোকান আছে।...রহমৎ খাঁ আর একবার হের টমাসের কাছে গিয়াছিল। আমরা এখন পর্য্যন্ত আপনার নিকট হইতে কোন খবর পাই নাই। আশা করি, ছাড়পত্রের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। সত্বর খবর দিতে পারিলে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব। ভবিষ্যতে যদি আপনি আমাকে

কোন খবর দিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহা আমার বন্ধুর দোকানে পাঠাইয়া দিবেন। প্রত্যেক দিন হের টমাসের কাছে লোক পাঠানটা নানা কারণে ভাল মনে করি না।”

আমি বোসবাবুর নিকট হইতে চিঠিখানি লইলাম এবং তাঁহার ঘরে তালা বন্ধ করিয়া দিলাম। চাবিটি আমার স্ত্রীর হস্তে দিয়া দোকানে আসিলাম। সেদিন বারটার সময় হের টমাসের দোকানে যাইবার কথা ছিল, আমি যথা সময়ে সেখানে গেলাম।

হের টমাস ঠিক সেই সময় দোকান হইতে বাহির হইয়া খানা খাইবার জন্য বাড়ীর দিকে চলিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলাম, আমি হের টমাসের সঙ্গে দেখা করিতে চাই, একটা জরুরী কাজ আছে। তিনি আমাকে অফিসের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, আমিই টমাস, আপনার কি বলবার আছে বলুন? আমি বোসবাবুর লিখিত পত্রখানি তাঁহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন খবর আছে কি? তিনি বলিলেন—না, বোসবাবুকে দিবার জন্য কোন খবর নাই।

সেদিন সন্ধ্যায় হাজী সাহেব আমার দোকানে আসিলেন এবং বোসবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মিনতির স্বরে বলিলেন—তাঁহার সঙ্গে একবার আমার দেখা করাইয়া দাও না।

হাজী সাহেবের সঙ্গে সুভাষবাবুর দেখাশোনা হোক তাহা আমার অভিপ্রেত ছিল না। অথচ হাজি সাহেব যখন জানেন যে বোসবাবু আমার বাড়ীতে আছেন তখন তাঁহার মনে আঘাত দেওয়াও চলে না। বাধ্য হইয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা, বোসবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব, যদি তিনি সম্মত হন তবে কাল দেখা করাইয়া দিব।

সেদিন রাত্রে আমরা বসিয়া রেডিও শুনিতে শুনিতে রাজনীতি আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমি আমার রেডিওটাকে কলিকাতার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছিলাম। সে সময় কলিকাতা কেন্দ্রে বাংলা গান হইতেছিল। বোসবাবু কিছুক্ষণ শুনিবার পরই উহা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, বেশ মিষ্টি গান হইতেছে কিন্তু। তিনি বলিলেন, আমি ছাড়া এখানে আর কেহ ত' বাংলা জানে না, অতএব বেশীক্ষণ বাংলা গান চলিলে আপনার প্রতিবেশীদের মনে সন্দেহ হইতে পারে।

পরে আমি তাঁহাকে হের টমাসের সহিত আমার সাক্ষাৎকারের কথা এবং হাজী সাহেবের কথা বলিলাম। তিনি কাহারও সহিত দেখাশোনা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তারপর আমি যখন কি ভাবে হাজী সাহেব গোপন কথা জানিতেন তাহা বলিলাম, তখন তিনি পরদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজী হইলেন।

অপরিচিতের দর্শন

৬ই ফেব্রুয়ারী এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল যাহার ফলে আমরা সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। সেদিন আমরা যখন সকালে বসিয়া চা খাইতেছিলাম, তখন 'আমার নীচের তলার ভাড়াটিয়া ছাদে যাইবার জন্য উপরে ওঠেন। সেখানে যাইতে হইলে আমরা যে ঘরে বসিয়াছিলাম, সে ঘরের নিকট দিয়া যাইতে হয়।' তিনি আমাদিগকে দেখিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমার ছোট মেয়েটির ভুলেই উহা ঘটিয়া গেল। বোসবাবুর ঘরে ঢুকিবার দুয়ার আমরা সব সময়েই বন্ধ করিয়া রাখিতাম। সেদিন মেয়েটি দুয়ার বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। আমরা আমাদের সহবাসীকে মিঃ আর বলিয়া ডাকিতাম। বোসবাবুকে দেখিয়াই তাঁহার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। কিয়ৎকাল তিনি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল তিনি বোসবাবুকে নিশ্চিত চিনিতে পারিয়াছেন। বোসবাবুও ব্যাপারটিতে একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, দুয়ারটা এভাবে আমাদের খুলিয়া রাখা বড়ই ভুল হইয়া গিয়াছে।

আমি মিঃ আরকে খুব ভালভাবেই জানিতাম এবং ইহাও জানিতাম যে, যদিও বা তিনি বোসবাবুকে চিনিয়া

থাকেন, তাহা হইলেও আমাদের অনিষ্ট হয় এমন কোন কাজ তিনি করিবেন না। ইতিপূর্ব্বে মিঃ আর সুভাষবাবুর অন্তর্দ্ধান সম্পর্কে অনেক গল্প আমার সঙ্গে করিয়াছেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কেও তাঁহার সঙ্গে আমার আলোচনা হইয়াছে বহুবার।

তবে একথা সত্য যে সুভাষবাবু যে বেশে ছিলেন সে বেশে তাঁহাকে চিনিতে পারা খুবই কষ্টসাধ্য। তাঁহার মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি ছিল আর পরনে ছিল অদ্ভুত ধরণের পোষাক। কিন্তু সুভাষবাবুর চক্ষে সে সময় চশমা ছিল। যত গোলযোগ ঘটাইয়াছে ঐ চশমা জোড়াই! দোকানে যাইতে যাইতে শুধু ভাবিতে লাগিলাম, কি ফ্যাসাদেই না পড়া গেল। মনে মনে ভয় হইতে লাগিল, হয়ত বা মিঃ আর ইতিমধ্যেই কাহারও পরামর্শ লইতে চলিয়া গিয়াছেন।

সারাটা দিন আমি বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। মিঃ আর-এর কোন কোন বন্ধুর নিকটেও যাইলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু শুনিতে পাইব, কিন্তু কাহারও নিকট কিছুই শুনিতে পাইলাম না।

সেদিন রাত্রিতে বোসবাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য হাজী সাহেবকে লইয়া আসিলাম। বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র শুনিতে পাইলাম যে, মিঃ আর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার পেটের অসুখ হইয়াছে, কিছুক্ষণ ধরিয়া তিনি প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আছেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী সকালে মিঃ আর আমার কাছে আসিয়া বলিলেন—আর ত আমি এ বাড়ীতে থাকিতে পারি না, আমার ভয় হইতেছে। ভীতিই কাল আমার এই অসুস্থতার কারণ।

আমি বলিলাম, এ বাড়ীতে ভয় পাইবার মত কি আছে? অনেক দিনই ত বাস করিয়া দেখিলেন।

তিনি বলিলেন,—এ বাড়ীতে যেন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। হয়ত বা আমি সেই প্রেতাত্মার ক্রোধভাজন হইয়াছি।

আমি উত্তরে বলিলাম—আমি এ সমস্ত বিশ্বাস করিনা। নিশ্চয় অন্য কোন কারণে আপনি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চান?

বোসবাবুর উপস্থিতিই তাঁহাকে ভয়ে খাঁচাছাড়া করিতেছে কিনা তাহা আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম, এবং এজন্যই ওকথা বলিলাম।

মিঃ আর উত্তর দিলেন—আপনি বিশ্বাস না করিতে পারেন কিন্তু আমি বিশ্বাস করি।

আমি বলিলাম—সত্য কথা বলছেন না কেন?

শেষকালে তিনি স্বীকার করিলেন—আসল কথা এই যে, আমার স্ত্রী আমাকে এই বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য করিতেছেন। তিনি বলেন যে, তিন চার দিন যাবৎ আপনার বাড়ীতে

দুইজন অপরিচিত লোক বাস করিতেছেন। এই জন্যই তিনি আর এখানে থাকিতে চাহেন না।

আমি বলিলাম,—দুইজন অতিথি আমার বাড়ীতে আছেন একথা ঠিক। তাঁহারা আমার আত্মীয়। লাগমান হইতে আসিয়াছেন। একজন আসিয়াছেন চিকিৎসার জন্য ; তাঁহাকে সকল সময়েই ঘরে থাকিতে হয়। আশা করি কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহারা চলিয়া যাইবেন। আপনার স্ত্রীর আপত্তি কোথায়?—তা বাড়ীতে তিনিই কি একমাত্র স্ত্রীলোক? আমারও ত স্ত্রী আছে, সন্তান আছে।

মিঃ আর—রাগ করিবেন না, এজন্যই আমি সোজা সত্য কথা বলিতে চাহি নাই। আমার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাহাতে যদি এ বাড়ীতে আর একদিনও থাকি, তাহা হইলে আমার প্রাণের আশা আর থাকিবে না। ভাড়ার জন্য ঘাবড়াইবেন না। আমার অংশের ভাড়া আমি নিয়মিত দিয়া আসিব।

তারপরেই মিঃ আর বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ভাবিলাম, ভালই হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার চিন্তা করিতে লাগিলাম। তিনি যদি আমাদের ধরাইয়া দেন? তিনি এখানে থাকিতে কিছু ঘটিলে তিনিও জড়াইয়া পড়িতেন। এখন ত তিনি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, অতএব আশঙ্কাটাকে একেবারে তুচ্ছ করা যায় না।

স্থির করিলাম যে, বোসবাবু এবং রহমৎ খাঁ কয়েক দিনের জন্য একটা সরাইতে গিয়া থাকিবেন। যদি দুই

তিন দিনের মধ্যে কিছু না ঘটে, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসেই আবার ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। যদিই বা মিঃ আর কোন অনিষ্টচিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও যাহাতে বোসবাবু এবং রহমৎ খাঁকে কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে না হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই ব্যগ্র ছিলাম।

কোন সরাইতে একটা ঘর খুঁজিবার জন্য অমরনাথকে সঙ্গে দিয়া রহমৎ খাঁকে পাঠাইয়া দিলাম। তিনটা সরাই খুঁজিয়া তাহারা একটা ঘর ঠিক করিল, আবশ্যক মত মালপত্রসহ বোসবাবু এবং রহমৎ খাঁকে সরাইতে পাঠাইয়া দিলাম।

যে দিন মিঃ আর বাড়ী ছাড়িয়া গেলেন তাহার পরদিন তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া আমাকে মিঃ আর কেন বাড়ী ছাড়িয়া গেলেন, আমাদের মধ্যে ঝগড়া হইয়াছে কি না, আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কোন ঝগড়া হইয়াছে কিনা ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিলেন।

আমি বলিলাম, আমি কিছু জানি না। মিঃ আর-এর কাছেই জিজ্ঞাসা করিবেন।

ইতালীয়দের নিকট হইতে কোন খবর আসিয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য রহমৎ খাঁ সেদিন বার তিনেক আমার বাড়ীতে আসিলেন। আমি বলিলাম, কোন খবর আসে নাই; আসিলে অমরনাথের মারফৎ পাঠাইয়া দিতাম।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম, মিসেস আর আমার স্ত্রীর কাছে আসিয়াছিলেন এবং কথাচ্ছলে অতিথিদের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমার স্ত্রী তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়া আমাদের বাড়ী ছাড়িয়া সেই দিনই নিজ গ্রামে চলিয়া গিয়াছেন। আমার স্ত্রী আরও বলেন যে, আপনার স্বামীর ঐরূপ করা মোটেই উচিত হয় নাই।

এই কথা শুনিয়া মিসেস আর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, কেন তিনি কি বলিয়াছেন? আমার স্ত্রী উত্তরে বলেন—আর কি বলিবেন, তিনি আমাদিগকে বড়ই লজ্জা দিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, আমার বাড়ীতে এমন অতিথি আছেন যাঁহারা দিনের বেলাও ঘরের বাহির হন না। এজন্যই আপনি নাকি এই বাড়ীতে থাকিতে রাজী হন নাই।

মিসেস আর—ভগবানের দোহাই, দিদি, তিনি একথা বানাইয়া বলিয়াছেন। আপনার ঘরে যে অতিথি ছিলেন সেদিন আমি জানিতামই না।

আমার স্ত্রী—এমন তাড়াহুড়া করিয়া মিঃ আর-এর চলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই। আমি ঠিক কথাই বলিতেছি। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় বাড়ী যাইয়া আপনার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

মিসেস আর—নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু তিনি

সত্য সত্যই যদি ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাদের ক্ষমা করিবেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া মিসেস আর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—শুনিয়াছেন কিনা জানি না, একটি মস্ত বড় লোক—তাঁর নামটা ভুলিয়া গেলাম—কলিকাতা হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

আমার স্ত্রী—আজ রেডিওতে শুনিয়াছি বটে; প্রতিদিনই এ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। আপনি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

মিসেস আর—তেমন কিছু না; কথাটা আমিও রেডিওতে শুনিয়াছি এবং আরও শুনিয়াছি যে, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর হইতেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে খুব খোঁজাখুঁজি করিতেছে।

আমার স্ত্রী—গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে খুঁজিতেছেন, তাহাতে আমার কি?

মিসেস আর চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমার স্ত্রী তাঁহাকে সকল ঘর ঘুরাইয়া আনেন। অতিথিরা যে এবাড়ীতে আছেন এরূপ কোন ধারণা মিসেস আর-এর মনে জন্মিতে যাহাতে না পারে এজন্যই আমার স্ত্রী এই কৌশল করিয়াছিলেন।

সেনোরা কারোনি

৯ই তারিখে ইতালীয় রাজদূতের পত্নী সেনোরা কারোনি আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমার নাম বলিলাম। তিনি একখানা এনভেলপ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, আপনার বন্ধুকে ইহা দিয়া দিবেন। আমি ইতালীয় রাজদূতের পত্নী। আপনার বন্ধু আপনার এখানে আছেন জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত। আপনিই বোধ হয় গতবার তাঁহার নিকট হইতে চিঠি লইয়া হের টমাসের ওখানে গিয়াছিলেন। পরদিন আবার আসিবেন এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সেনোরা কারোনি যে চিঠিখানা আনিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ।

"আপনার পত্র পাইয়াছি। সরাই হইতে আপনি আপনার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনার কথামত আমরা আপনার বন্ধুর দোকানে খবরাখবর পাঠাইব। আমাদের জন্য যদি কোন খবরাখবর থাকে তাহাও ঐ স্থান হইতে লইয়া আসিব। আপনি রোম এবং বার্লিনের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইয়া যে খবর পাঠাইতে বলিয়াছিলেন তাহা পাঠান হইয়াছে। ছাড়পত্র পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। আমরা আমাদের মস্কোস্থিত রাজদূতকে উহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছি। সমস্ত ঠিক হইয়া গেলেই আপনাকে জানাইব।"

আমি সরাই হইতে রহমৎ খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলাম এবং তাহাকে চিঠিখানি দিলাম। আমার স্ত্রী এবং মিসেস আর-এর মধ্যে যেসমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহাও রহমৎ খাঁকে জানাইলাম।

সেদিন মিঃ আর সম্পর্কে আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। অকস্মাৎ মিঃ আর বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় আমাদের জানাশোনা বন্ধুরা সকলেই বিস্মিত হইলেন। কেহ তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি একই উত্তর দিয়াছেন—আমি হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই ঐ বাড়ীটা ছাড়িয়া দিয়াছি।

মিসেস আর এবং আমার স্ত্রীর মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আমার মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, মিঃ আর সকল কথা তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী সকালে কিছু তরকারী কিনিবার জন্য বাজারে গিয়াছিলাম। দেখি মিঃ আর তাহার ছোট মেয়েকে কোলে করিয়া চলিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—আপনি যে একেবারে বাতাসে মিলাইয়া গেলেন। দুদিন যাবৎ আপনাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি কিন্তু পাইতেছি না। এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনার নূতন বাড়ীর ঠিকানা কি? মিঃ আর বলিলেন, নূতন বাড়ীতে যাওয়ার পর হইতেই অসুখে ভুগিতেছি, গত কল্য দোকানে যাইতে

দেরী হইয়াছিল। 'শরীরটা ভাল না লাগায় কিছুক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া আসিয়াছি। আমার নূতন বাড়ীর ঠিকানা ………। সাময়িক ভাবে 'ঐ বাড়ীটা ভাড়া লইয়াছি কেননা, এখনই আর ভাল বাড়ী কোথায় পাইব।

'শেষকালে আমি মিঃ আরকে বলিলাম, আমি জানি কেন আপনি বাড়ী ছাড়িয়াছেন। আপনি অবশ্য সেকথা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু আপনার স্ত্রী আমার স্ত্রীর কাছে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আপনি ভয় পাইয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে আপনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে আপনি সুভাষবাবুকে চিনিতে পারিয়াছেন।

মিঃ আর আমার কথার উত্তরে বলিলেন—কি করিয়া আমি সত্য কথা বলিতাম বলুন। সেদিন যখন আপনারা চা খাইতেছিলেন তখন আমি সুভাষবাবুকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। ভয়ে আমার প্রাণপাখী খাঁচাছাড়া হইয়া গিয়াছিল। আমি জানিতাম যে, সুভাষবাবুর জন্য খুব খোঁজাখুঁজি হইবে। আফগানিস্থান ভারতবর্ষের সংলগ্ন। অনেকেই আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া মস্কোতে পালাইয়াছে। কাজেই এখানে যে খোঁজাখুঁজি হইবে তাহা নিশ্চয়। আপনার বাড়ীতে তাঁহাকে পাওয়া গেলে পরিণাম যে কি হইবে তাহা আমি জানিতাম। আমার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে। আমি কোনমতেই এই দুর্গতির ঝুঁকি লইতে

পারি না। আপনি এবং আপনার স্ত্রী যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না।

আমি বলিলাম, আপনার হঠকারিতা যে আমাদের কি ক্ষতি করিয়াছে তাহা বলিবার নহে। সুভাষবাবুর উপস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া আপনার অবস্থা কি হইয়াছিল যখন তিনি তাহা জানিতে পারিলেন, তখনই বিরক্ত হইয়া এই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এখন না জানি কোথায় তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

মিঃ আর উত্তর দিলেন—ভাই, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। বলুন, এখন আমি কি করিতে পারি ?

আমি—এখন আর কি করার আছে বলুন! তিনি আমার বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। হয়তো তিনি এখন কাবুলেই আছেন। তবে আপনাকে একটা কথা বলিয়া রাখি, যদি তিনি এখানে গ্রেপ্তার হন তাহা হইলে তাহার দায়িত্ব, তাহার কলঙ্ক, আপনার উপরই বর্ত্তাইবে।

বেলা বারোটার সময় আমি দোকানে পৌঁছিবামাত্র রহমৎ খাঁ আসিয়া হাজির হইলেন। তাহাকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত দেখাইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—সব ভালো তো ?

রহমৎ খাঁ বলিলেন—বোসবাবু হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বাজারের খাবার খাইয়া তাঁহার আমাশয় হইয়াছে। বাজারে শুক্‌না রুটি আর কাবাব ছাড়া কিছু পাই নাই, এখন যে কি করি তাহাই ভাবিতেছি। একজন

ডাক্তার ডাকাইয়া যে তাঁহাকে দেখাইব তাহারও উপায় নাই। তাই আপনার পরামর্শ লইতে আসিয়াছি।

আমি বলিলাম—আমি কি পরামর্শ দিব? মিঃ আর সম্বন্ধে আপনাকে সব কথা বলিয়াছি। সে দিক দিয়া বিপদ এখনও কাটে নাই। এদিকে বোসবাবুকে এ অবস্থায় সরাইতে ফেলিয়া রাখাও চলে না। তাহা করিতে গেলে হয়তো তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কাজেই এ অবস্থায় আপনারা দুই জনেই আমার বাড়ী চলিয়া আসুন। বাড়ীতে রাখিয়া আমরা তাঁহার সেবাযত্ন করিব। আশা করি, তিনি তাহাতেই সুস্থ হইয়া উঠিবেন।

রহমৎ খাঁ আমার মতে সায় দিলেন এবং রাত্রি সাতটার সময় বোসবাবুকে লইয়া পুনরায় আমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন এই কথা বলিয়া গেলেন।

অনুমান সাড়ে সাতটার সময় তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলেন; আশেপাশের কেহই ব্যাপারটা টের পাইল না। বোসবাবুকে খুব ফ্যাকাশে দেখাইতেছিল। দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনি আমাশয় খুবই কষ্ট পাইতেছেন। বাড়ীতে কয়েকদিন সেবাযত্নের পরই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

পুনরায় আমার বাড়ীতে আসিয়া রহমৎ খাঁ এবং বোসবাবু নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলেন। আগের মতই যাইবার সময় প্রতিদিন বোসবাবুর ঘরে তালা লাগাইয়া চাবিটি আমার স্ত্রীর হাতে দিয়া যাইতাম। যাহাতে

প্রতিবেশীদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও উদয় না হয়, তাহার জন্য আমার স্ত্রী সর্ব্ব প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন কি সুভাষবাবু যখনই কাশিতেন তখনই আমার স্ত্রী জোরে জোরে শব্দ করিয়া যাহাতে সে কাশির শব্দ কেহ শুনিতে না পায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতেন।

তখন কাবুলে তুষারপাত বন্ধ হইয়াছে। উপরে মেঘমুক্ত পরিচ্ছন্ন আকাশ আর নীচে তুষার ধবল দিগ্বলয় প্রাতঃসূর্য্যের অরুণাভায় ঝলমল করিতেছে। আশেপাশের বাড়ীর মেয়েরা সকালে রোদ পোহাইবার জন্য ছাদে আসিতে আরম্ভ করিল। সুভাষবাবুর কাশির শব্দ তাহাদের পক্ষে সব সময়ই শোনার সম্ভাবনা ছিল। আমার স্ত্রীর সাবধানতায় তাহারা শুনিতে পায় নাই।

মস্কোতে গোলমাল

এই ভাবেই একটা সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু ইতালীয় দূতাবাস হইতে কোনও খবরই আসিল না। সেনোরা কারোনি আমার দোকানে দুই তিনবার আসিলেন, কিন্তু কোনও খবর আনিতে পারিলেন না। ছাড়পত্রের কতদূর কি হইল এই প্রশ্ন যতবারই তাঁহাকে করি তিনি শুধু বলেন—কেন যে দেরী হইতেছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। প্রত্যেক দিন রোমস্থ কর্ত্তৃপক্ষকে মনে করাইয়া দিতেছি, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পাইতেছি না।

বোসবাবু ভাল হইয়া উঠিলে রহমৎ খাঁ আবার বাজারে বাহির হইতে আরম্ভ করিলেন। এক সপ্তাহের পরও যখন ইতালী হইতে কোনও সন্তোষজনক কিছু জানা গেল না, তখন বোসবাবু আবার একখানি পত্র লিখিয়া তাহা হের টমাসের মারফৎ সেনোরা কারোনির নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। এই পত্রে লেখা হইয়াছিল যে, "ইতালীয় দূতের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের পর তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল, এবং মস্কোস্থ ইতালীয় দূতও ছাড়পত্রের যে ব্যবস্থা করিতেছেন এরূপ খবর পাওয়ার পরও দুই সপ্তাহ চলিয়া গেল। তারপর আর কোনও খবর নাই। কেন যে দেরী হইতেছে, বুঝা যাইতেছে না। পত্রের শেষে বলা হইয়াছিল—আমি যে এখানে অনির্দ্দিষ্ট কাল বসিয়া থাকিতে পারি না, বোধ হয় এ কথাটি আপনি বুঝিতে পারিবেন। অনুগ্রহ করিয়া সত্বর ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করুন।

পর দিন সেনোরা কারোনি আমার দোকানে আসিলেন আমি তাঁহার হাতে বোসবাবুর চিঠিখানি দিলাম। এবং তাহার পরদিনই তিনি বন্ধ করা আর একখানা এনভেলাপ বোসবাবুর জন্য লইয়া আসিলেন।

সেনোরা কারোনি উহার মধ্যে উত্তরে লিখিয়াছেন যে বোসবাবুর চিঠি পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি মি বোসের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু তিনিও নিরুপায় সম্ভবতঃ ছাড়পত্র লইয়া মস্কোতে কোনও গোলমাল হইয়াছে

মস্কো হইতে কোনও খবর পাওয়ামাত্রই তিনি বোসবাবুকে তাহা জানাইবেন।

এই পত্রখানি পাঠ করিয়া বোসবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি রুশদূতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি কি না। আমি বলিলাম—অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। একবার একজন রুশীয় একটা রেডিও-সেট কিনিবার জন্য আমার দোকানে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সহিত কথাটা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি রাজনীতি আলোচনা করিতে অস্বীকার করেন। আমি তাঁহাকে কয়েকটি কথাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি একটি কথারও ভাল রকম উত্তর দিতে পারেন নাই। আমি দুই একজন বন্ধুকেও রাশিয়ানদের সঙ্গে ভাব করিবার কথা বলিয়াছিলাম। বন্ধুরা সকলেই দোকানদার ; রাশিয়ানরা প্রায়ই তাঁহাদের দোকানে আসে। কিন্তু তাঁহারাও কিছু করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

বোসবাবু বলিলেন—তার চেয়ে আপনি একটা কাজ করুন। আপনার সঙ্গে যদি কাহারও ভাল জানাশুনা থাকে তবে আমি একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি, পত্রখানি কাহারও মারফৎ রুশ দূতাবাসে পাঠাইয়া দিন। রাশিয়ানরা প্রায়ই আপনার এবং আপনার বন্ধুদের দোকানে আসে ; তাহাদের কেহই পত্রখানি রুশদূতের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে অস্বীকার করিবে না।

আমি বলিলাম—আচ্ছা, তাহাই করিব।

বোসবাবু একটি দীর্ঘ পত্র লিখলেন। উক্ত পত্রে তাঁহার ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন কাহিনী, এখানে উপস্থিতি, এবং রুশদূতের সহিত কথা বলিবার মানসে তাঁহার গাড়ী থামাইবার কথা বর্ণনা করিলেন। সর্ব্বশেষে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, চিঠির উত্তর যেন আমার দোকানে দেওয়া হয়।

আমি চিঠিখানি লইয়া আমার ও আমার বন্ধুদের দোকানে যে সমস্ত রাশিয়ান আসিয়া থাকে তাহাদের কাহারও হাত দিয়া পাঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় চিঠিখানি কেহই লইতে রাজী হইল না।

তখনও রাশিয়া এবং জার্ম্মাণীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। জার্ম্মাণরা নির্ব্বিবাদে দেশের পর দেশ দখল করিয়া যাইতেছিল। প্রতি সপ্তাহে জার্ম্মাণ দূতাবাসে একটা না একটা বিজয়-উৎসবে রাশিয়ান, ইতালীয়ান, জাপানী এবং অন্যান্য দূতেরা যোগ দিত। রাশিয়ান দূতাবাসেও মাঝে মাঝে ঐ ধরণের দুই একটি পার্টি হইত।

তৎকালে কাবুলে একজন জার্ম্মাণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম............। জার্ম্মাণীর রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের এক কারবারির প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি সেখানে থাকিতেন। আমার এক বন্ধুও ঐখানে রঙ-এর কারবার করিতেন। তাঁহার মারফৎ আমি এই জার্ম্মাণটিকে চিনিতাম। তিনি

কিছুদিন পূর্ব্বে রাশিয়ান দূতাবাসে এক ভোজসভায় যোগ দিয়াছিলেন। সেখানে শীঘ্রই আর একটা ভোজসভার কথাও ছিল; সেই ভোজসভায় তাঁহারও নিমন্ত্রণ আছে তাহা আমি শুনিয়াছিলাম। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি আমার একখানা চিঠি রাশিয়ান দূতের হাঁতে পোঁছাইয়া দিতে পারিবেন কি না। চিঠিখানি কিন্তু তাঁহাকে নিজের হাতে রুশ দূতকে দিতে হইবে। কথাটি শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু পরদিনই আবার অস্বীকার করিয়া বলিলেন—আমাদের দূত আমাদিগকে রুশদূতের সহিত কোন প্রকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এও নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, যদি রুশদূতের সহিত কাহারও কোন কাজ থাকে তাহা হইলে তাহা জার্ম্মাণ দূতের মারফৎ করিতে হইবে। যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমি আমাদের দূতের অনুমতি চাহিব। তিনি অনুমতি দিলে আমি চিঠিখানি লইয়া যাইব।

বোসবাবু যে রাশিয়ানদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন—এ কথা ইতালীয়ান বা জার্ম্মাণরা জানুক এই ইচ্ছা বোসবাবুর ছিল না। সুতরাং আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম না।

বার্ত্তাবাহকের প্রতীক্ষায়

দুই দিন পরে সেনোরা কারোনি আর একখানি পত্র লইয়া আসিলেন। এই পত্রে ইতালীয় দূত জানাইয়াছেন যে, ছাড়পত্র সম্বন্ধে মস্কোতে কোন গোলমাল হইয়াছে বলিয়া প্রথমে তিনি যে সন্দেহ করিয়াছিলেন সেই সন্দেহই ঠিক। মস্কোস্থ ইতালীয় এবং রুশ দূতেরা বার্লিন বা রোমে রাশিয়ার মধ্য দিয়া বোসবাবুকে যাইবার অনুমতি যাহাতে দেওয়া হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রুশ সরকার সেই সুবিধা দিতে প্রস্তুত নহেন। শেষ পর্য্যন্ত অতি কষ্টে রাশিয়ানদের সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। এ পত্রে আরও বলা হয়—রোম হইতে আপনার অন্য বার্ত্তাবাহক আসিতেছে। তাহারা আসিয়া পৌঁছিলেই আপনার রওনার ব্যবস্থা করা হইবে ; এখন আর বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমি বোসবাবুকে প্রশ্ন করিলাম—বার্ত্তাবাহক কথাটার অর্থ কি ?

তিনি বলিলেন—যাহারা কোন খবর লইয়া আসে তাহাদিগকে বার্ত্তাবাহক বলে। তাঁহার মনে হয়, সম্ভবতঃ ছাড়পত্র সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই ; সুতরাং এমন কোন লোককে পাঠান হইতেছে যাহার ছদ্মনাম তাঁহাকে লইতে হইবে এবং তাহার স্থলবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে যাইতে হইবে।

এই ভাবে আশা-নিরাশার মধ্যে আরো একটা সপ্তাহ কাটিয়া গেল কিন্তু কোন কিছুই খবর আসিয়া পৌঁছিল না। দুই তিন দিন পর পরই সেনোরা কারোনি সুভাষবাবু কেমন আছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমার দোকানে আসিতেন। দোকানে কোন খরিদ্দার দেখিলেই তিনি কোন একটি জিনিষ খরিদ করিতেন অথবা জিনিষের দাম জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহার পর কাল আসিয়া কিনিয়া লইয়া যাইব বলিয়া চলিয়া যাইতেন।

বোসবাবু রাতদিন একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ বসিয়া থাকিতে থাকিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার বাজারে বাহির হইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে রহমৎ খাঁ কাবুলের সমস্ত বাজার চিনিয়া ফেলিয়াছেন। পাঠানের পোষাক ছাড়া আর কোন পোষাক সুভাষবাবুর ছিল না। সেই পোষাকে বাহির না হইয়া কাবুলি পোষাকে তিনি বাহির হউন, ইহাই আমার মত ছিল। আমি তাঁহাকে একটা ফ্লানেলের পোষাক দিলাম। পোষাকটা ঠিক ঠিক তাঁহার গায়ে লাগিয়া গেল। আমার এক জোড়া জুতাও তাঁহাকে দিলাম, কিন্তু তাহা তাঁহার পায়ে বড় কষা হইল। সুভাষবাবু বলিলেন, তিনি বাজারে যাইয়া এক জোড়া জুতা কিনিয়া লইবেন। আমার আফগানী টুপিটা তিনি মাথায় দিলেন। তাঁহাকে দেখিতে ঠিক আফগানের মতই মনে হইল। এক জোড়া

জুতা কিনিয়া সারাদিন সমস্ত সহরটা ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় বোসবাবু ও রহমৎ খাঁ দোকানে আসিলেন। আমরা সকলে মিলিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন

রাত্রিতে বোসবাবু বলিলেন—যে দোকান হইতে জুতাজোড়া কিনিয়াছি সেই দোকানটির মালিক একজন ভারতীয়। তিনি আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমরাও ভারতীয়। আমি ভারতীয় কিনা সে কথা তিনি জিজ্ঞাসাও করেন। উত্তরে আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আমি ভারতীয়ই বটে—এখানে হাবিবিয়া কলেজে অধ্যাপনার কাজ করি—আমার নাম জিয়াউদ্দিন। আশ্চর্য্য হইয়া দোকানদার বলিলেন, ঐ কলেজে যত ভারতীয় অধ্যাপক আছেন তাঁহাদের সকলকেই তিনি চিনেন, কিন্তু আমাকে ত কখনও দেখেন নাই। তাহাতে আমি বলিলাম—আমি মাত্র কয়েক দিন হইল আসিয়াছি। এ দেশের ভাষা জানি না, তাই বড় একটা বাহির হই না। দোকানদার মহাশয় আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এত মশ্‌গুল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে জুতাজোড়া দিতেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আর বেশীক্ষণ কথাবর্ত্তা বলা নিরাপদ নহে দেখিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম—আমার একটা কাজ আছে, তাড়াতাড়ি আমার জুতাজোড়া বাঁধিয়া দিন

আমরা চলিয়া আসিব এমন সময় তিনি বলিলেন—একটু চা খাইয়া যাইতে আপত্তি আছে কি'? আমি 'বড়ই ব্যস্ত অতএব আজ বিদায় লই—বলিয়া আমি তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিলাম। এখন তিনি হাবিবিয়া কলেজে গিয়া প্রফেসার জিয়াউদ্দিনের খোঁজ করুন।

বোসবাবুর কথায় সেদিন আমার প্রাণ খুলিয়া হাসিলাম।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গে সুভাষবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে তিনি মস্কো যাইতে চাহেন।

তিনি বলিলেন—রুশ ও জার্ম্মাণদের মধ্যে সম্প্রতি একটা চুক্তি হইয়াছে যে, তাহারা পরস্পর আক্রমণ করিবে না। জার্ম্মাণী ব্রিটেনের সহিত যুদ্ধরত এবং রাশিয়া ব্রিটেনের শত্রু; এখনই মস্কো যাইয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচারকার্য্য চালাইবার শুভ অবসর।

এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম—রাশিয়া এবং জার্ম্মাণী বর্ত্তমানে শান্তিতেই আছে বটে; কিন্তু উভয়ের আদর্শবাদের মধ্যে আদৌ কোন মিল নাই। বন্ধুত্বের অন্তরালে যে পারস্পরিক যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে না, সে কথাই বা কে বলিতে পারে? সে ক্ষেত্রে রাশিয়ানরা কি আপনাকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে দিবে?

আয়ারল্যাণ্ডের উদাহরণ

উত্তরে সুভাষবাবু বলিলেন—হয়তো জার্ম্মাণ এবং রুশদের মধ্যে শান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না, তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে। আজকাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে যে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কি ঘটিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই ধরুন, জার্ম্মাণী এবং রাশিয়ার মধ্যে যে একটা মৈত্রী-চুক্তি হইতে পারে, একথাও তো কখনও কেহ ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু সে চুক্তি তো হইল। জার্ম্মাণী এবং রাশিয়ার মধ্যে তলে তলে একটা বৈরীভাব চলিতে থাকিলেও—ইংরাজরাও তো কিছু রাশিয়ার বন্ধু নহে। কাজেই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, রাশিয়ানরা আমাকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে দিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কি মনে করেন শুধু প্রচারকার্য্য দ্বারাই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে ?

সুভাষবাবু বলিলেন—আমার নিজের বিশ্বাস যে, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের সাহায্যে ইংরাজকে তাড়াইয়া না দিলে সে কখনই ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবে না। তাহারা কখনও কোনও দেশকে শান্তভাবে স্বাধীনতা দেয় নাই। আয়ারল্যাণ্ডের কথাই ধরুন না কেন। আইরিশরা ইংরাজদের জ্ঞাতি। সাত

শত বৎসরের সংগ্রাম এবং অসাধারণ কষ্ট সহ্য করিবার পর আয়ারল্যাণ্ড যখন স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল, তখনও ইংরাজরা আয়ারভূমির কিয়ৎখণ্ড নিজেদের জন্য রাখিয়া দিল; সুতরাং তাহারা স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে কি করিয়া?

একথা সত্য যে বিদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারকার্য্যের দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যাইবে না, কিন্তু ইংরাজরা এখন জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত; আমার প্রচারকার্য্য নিশ্চয় তাহাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আয়ারল্যাণ্ডে যেরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছিল ভারতবর্ষেও সেরূপ বিপ্লব ঘটিতে পারে, একথা কি আপনি মনে করেন?

উত্তরে সুভাষবাবু বলিলেন—ইংরাজরা ভারতবর্ষের যে দুর্গতি সাধন করিয়াছে, তাহাতে ঐরূপ বিপ্লব সম্ভব নহে; ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি করাও কষ্টসাধ্য। অধিকন্তু কোন বিদেশী শক্তির সহায়তা ভিন্ন ঐরূপ বিপ্লব সৃষ্টি করাও সম্ভব নহে। এমন যে রুশ-বিপ্লব—তাহার পশ্চাতেও ছিল জার্ম্মাণরা। আমেরিকা তাহার স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিল ফরাসীদের সহায়তায়।

প্রশ্ন করিলাম—আপনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য রাশিয়ার সাহায্য সংগ্রহ করিতে যাইতেছেন—আপনার কথার তাৎপর্য্য কি ইহাই?

সুভাষবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, উহাই আমার আসল মতলব। যাহাতে রাশিয়ানরা আমাদিগকে সাহায্য করিতে সম্মত হয়, তাহার জন্য আমি চেষ্টা করিব। আমি ব্যর্থকাম হইলেও ইংরাজদের বিরুদ্ধে সব সময়ই আন্দোলন চালাইতে পারিব।

আমি যদি ভারতে পাড়য়া থাকতাম তাহা হইলে যতদিন যুদ্ধ চলিত ততদিন গবর্ণমেণ্ট আমাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিতেন। আমার স্থির বিশ্বাস যে, দেশের অন্যান্য বড় বড় নেতাদের সকলকেই কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। কারাগারে বসিয়া পচা অপেক্ষা দেশের স্বাধীনতার জন্য যতটুকু করিতে পারি ততটুকুর জন্য পলায়ন করাই আমি ভাল মনে করিলাম।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—যদি এখান হইতে সোজা মস্কো যাইতে না পারেন তবে কি করিবেন?

সহজ ভাবেই তিনি উত্তর দিলেন—যাইবার পথে একবার মস্কোতে নামিবার এবং সেখানে থাকিবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। যদি না পারি তাহা হইলে বার্লিন এবং রোমের রুশ দূত মারফৎ চেষ্টা করিয়া দেখিব। ঐ সমস্ত স্থানে রুশ দূতের সাহায্যে অবাধে যাওয়া-আসা করা যায়। কাজেই ভরসা করি, কোন-না-কোন একটা ব্যবস্থা করিতে পারিব। সে কথা যাক, আমি শীঘ্রই মস্কো পৌঁছিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

চক্রশক্তি তাঁহাকে মস্কো যাইতে দিবে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দেহ প্রকাশ করিলাম। আমি বলিলাম যে, এখন যে রকমের যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে চক্রশক্তি যদি তাঁহার মত এক জন প্রতিপত্তিশালী লোক পায় তবে রুশিয়ার কাজে লাগাইতে না দিয়া নিজেদের কাজেই লাগাইবার চেষ্টা করিবে।

উত্তরে সুভাষবাবু বলিলেন—তাহারা যে সহজে আমাকে রুশিয়ানদের হাতে ছাড়িয়া দিবেন না, একথা আমিও জানি। তবু আমি মস্কোতে যাইবার জন্য সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিব। আজ একমাত্র রাশিয়াই ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে সমর্থ। আর কোন দেশই আমাদিগকে সাহায্য করিবে না। এ জন্যই আমি মস্কো ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে চাহি না। এই যুদ্ধের মধ্যেই যদি ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে না পারে, তবে তাহাকে আরও পঞ্চাশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য তাহার আগে যদি সশস্ত্র বিপ্লব হয়, তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

ভারতে বিভেদের প্রশ্ন

কথা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে ধর্ম্মগত বিভেদের কথা বোসবাবুকে মনে করাইয়া দিলে তিনি বলিলেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেশে একটা তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ ইংরাজরা থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিভেদ শেষ হইবে না, বরং বাড়িয়াই চলিবে। কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত বজ্রের মত কঠোর কোন

ডিক্টেটর যদি ভারতবর্ষ শাসন করেন তাহা হইলে এই বিভেদ দূর হইতে পারে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসন অবসানের পর অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ডিক্টেটরশিপের প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। এদেশে অন্য কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চলিবে না। প্রথম প্রথম যদি ভারতবর্ষ একজন ডিক্টেটর দ্বারা শাসিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে। ডিক্টেটর ব্যতীত অপর কেহ এই বিভেদ মুছিয়া ফেলিতে পারে এরূপ ক্ষমতা অপর কোন শক্তির নাই। ভারতের ব্যধিও একটা নহে। বহু রাজনৈতিক ব্যাধিতে ভারতবর্ষ ভুগিতেছে। একমাত্র কোনও নির্ম্মম ডিক্টেটরই সেই ব্যাধি দূর করিতে সমর্থ। ভারতবর্ষের প্রয়োজন হইতেছে কামাল পাশার মতন একজন লোকের।

ভারতে বিভেদের প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আবার আমাদের কথার মোড় ঘুরিল, আমি বলিলাম—আপনি কি মনে করেন যে, রুশ দূত নিজের ইচ্ছাতেই আপনাকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছেন অথবা তিনি রুশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতেছেন?

উত্তরে বোসবাবু বলিলেন—তাহা আমি কি করিয়া জানিব? যদি অন্ততঃ একবারও তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিতাম তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, রুশ গবর্ণমেণ্টের নীতি কি। রুশ দূত আমার সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন হয়তো বা তাহা তাঁহার নিজেরই নীতি। এজন্য

যাঁহারা আমার এখানে আগমনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহারাই দায়ী। রুশ দূতের সহিত জানাশুনা আছে এমন একজন লোককে যদি তাঁহারা আমার সঙ্গে দিতেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তাঁহার মনোভাব অন্য রকম হইত। আমাকে রাশিয়ার মধ্যে দিয়া অতিক্রম করিতে দিতে মস্কো কর্তৃপক্ষ যে দ্বিধা করিয়াছেন, ইতালীয়দের মারফৎ সেই সংবাদে আমার কেমন একটা সন্দেহ হইতেছে। রাশিয়ানরা কেন আমাকে তাঁহাদের দেশের মধ্য দিয়া যাইতে দিতে চাহিতেছেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। হয়তো তাঁহারা আমাকে দলে লইতে ইচ্ছুক নহেন এবং তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ অনুযায়ী এখানকার রুশ দূত কার্য্য করিয়াছেন।

সুভাষবাবু বলিতে লাগিলেন—আর একটা দিকও ভাবিবার আছে। রহমৎ খাঁ যখন রুশ দূতের সঙ্গে দেখা করেন তখন হয়তো তিনি আমাকে সাহায্য করা সম্পর্কে তাঁহার গবর্ণমেন্ট হইতে কোন নির্দ্দেশ পান নাই। তাহার পর হয়তো তিনি আমার এখানে উপস্থিতির কথা জানাইয়া থাকিবেন। এখন হয়তো আমাকে সাহায্য করার নির্দ্দেশ আসিয়া থাকিতে পারে। আমার ঠিকানা না জানায় হয়তো আমাকে কোন খবর দিতে পরিতেছেন না। রাশিয়ার মধ্য দিয়া আমাকে লইয়া যাইবার জন্য যখন ইতালীয়রা রাশিয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন তাঁহারা আমি যাহাতে চক্রশক্তির হাতে না পড়ি তাহাই

চাহিয়াছিলেন বলিয়া অনুমতি দেন নাই। হয়তো আমি মস্কোতে যাই ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। এই সম্ভাবনাটাই আমার যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তাঁহারা আমাকে চাহেন না, ইহার কোন অর্থই হইতে পারে না। যাক, সত্য কথা জানিবার যখন উপায় নাই তখন অনুমান ছাড়া উপস্থিত আর কিছুই করিবার নাই।

বোসবাবু আমার সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ দিন ছিলেন। চক্রশক্তির অনুকূলে একদিনও একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে শুনি নাই। তিনি ইংরাজদিগকেও যেমন ঘৃণা করিতেন, চক্রশক্তিকেও তেমনি ঘৃণা করিতেন। তিনি বার্লিনে পৌঁছিয়া মস্কো যাইবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার পর রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ ঘোষিত হইলে তাঁহার রাশিয়ায় যাইবার আশা একেবারে লোপ পায়। তিনি ১৯৪১ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে বার্লিনে পৌঁছেন। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখে রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ ঘোষিত হয়।

তাহার পর আরও একটা সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কিন্তু ইতালীয় দূতাবাস হইতে কোন খবরই আসিল না। এই সময় সেনোরা কারোনি দুইবার আমার দোকানে আসিয়া বলিলেন যে, যে বার্ত্তাবাহকদের আসিবার কথা আছে, তাহারা এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

যতই বিলম্ব হইতে লাগিল বোসবাবু ততই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি একটা দারুণ অবসাদ বোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম যে, মাঝে মাঝে বাজারে যাইয়া ঘুরিয়া আসুন। কিন্তু তিনি সে সময় বাড়ী হইতে বাহির হওয়ায় অসম্মত হইলেন।

একদিন হাজী সাহেব তাঁহাকে চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তিনি চা খাইতে গেলেন। তারপর প্রায়ই তিনি হাজী সাহেবের বাড়ীতে যাইতেন।

এক দিন বোসবাবু বলিলেন—জানি না ইতালীয়ানরা কবে আমার যাত্রার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে পারিবে। বার্ত্তাবাহকরা এখন পর্য্যন্ত রোম হইতে রওনাই হয় নাই। এখন আমার জীবন দুর্ব্বিষহ মনে হইতেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, এখানে আসিয়া হয়তো একটা মস্ত বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। এই জঘন্য সঙ্কীর্ণ স্থান হইতে যে কোন প্রকারে পারি আমাকে যাইতেই হইবে। আপাতত দেখুন, এমন কোন লোক সংগ্রহ করিতে পারেন কিনা যে আমাকে রুশ সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে। এখানে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকার চেয়ে বরং আমি রাশিয়ার কারাগারে জীবন যাপন করিব। রাশিয়ার কারাগারের মধ্যে দিয়া তবু যাহোক মস্কো পৌঁছিবার হয়তো একটা উপায় হইবে। যদি পারেন এ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন। খরচার জন্য ভাবিবেন না।

আমি বলিলাম—রুশ সীমান্ত পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে যাইতে পারে এমন লোক সংগ্রহ করা কিছু বেশী কঠিন কথা নয়। আমি এমন অনেককে জানি যাহারা গোপনে সীমান্ত পার হইয়া রাশিয়ায় যায় এবং ফিরিয়াও আসে। তবে কিনা উহা বড়ই কষ্টসাধ্য—পথ অত্যন্ত দুর্গম।

সঙ্গে সঙ্গে বোসবাবু জবাব দিলেন—যে অবস্থায় আছি তাহার চেয়ে খারাপ আর কি হইবে। বড় জোর রাশিয়ানরা আমাকে ধরিয়া জেলে পুরিবে। তারপর যখন রাশিয়ান গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিবে যে, তাহাদেরই এক কারাগারে আমি অবস্থান করিতেছি তখন তাহারা আমাকে নিশ্চয় মুক্ত করিয়া দিবে।

আমি বলিলাম—যদি তাহাই হয় তবে অনেক আগেই আপনার রাশিয়ায় পলায়নের ব্যবস্থা করা হইত।

বোসবাবু বলিলেন—এখনও সময় যায় নাই। আপনি এক জন চলন্দার খুঁজিয়া বাহির করুন। রহমৎ খাঁনকে বলিয়া দিয়াছি বাজার হইতে একখানা আফগানিস্থানের ম্যাপ কিনিয়া আনিতে। ম্যাপ দেখিয়া স্থির করিব রুশ সীমান্তে পৌঁছিবার সবচেয়ে ভাল ও সোজা পথ কোন্‌টা।

মিঃ এম

হ্যাঙ্গো নদীর এক পারে রাশিয়া অপর পারে আফগানিস্থান। আমি একটি লোককে জানিতাম, যে অনেকবার হ্যাঙ্গো নদী পর্য্যন্ত যাতায়াত করিয়াছে কিন্তু নদী পার হইয়া রাশিয়ায় যায় নাই। কথা প্রসঙ্গে সে অনেকবার আমাকে বলিয়াছে, নদীটা পার হওয়া খুবই সহজ। তার নাম 'এম'……। 'এম' ছিল আসলে সীমান্ত অঞ্চলের লোক। সে এক জন লোককে খুন করিয়া আফগানিস্থানে আসিয়া ফেরার অবস্থায় বসবাস করিতেছিল। এবং স্থানীয় লোকের নিকট পরিচিত ছিল মহাজির নামে। প্রায় কুড়ি বৎসর কাল সে আফগানিস্থানে আছে। এক আফগান রমণীকে সে বিবাহ করিয়াছে এবং এখানকার প্রজা হইয়া গিয়াছে। এক সময় সে লরীও চালাইত। আফগানিস্থানের অন্তর্গত হ্যাঙ্গো নদীর তটবর্ত্তী পাটকেশ্বর পর্য্যন্ত সে যাতায়াত করিয়াছে। লোকটা বিশ্বস্ত। অনেক দিন বেকার থাকিয়া সে সময় বড়ই অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আফগান স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের সময় উৎসবক্ষেত্রে সে ছোটখাট একটা জুয়ার আড্ডা বসাইত। তাহাতে যে আয় হইত তাহার দ্বারাই সম্বৎসরের খরচ চালাইত। মনে মনে ভাবিলাম, কোন রাজনৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোককে হাতে রাখা কঠিন হইবে। কিন্তু

এই লোকটাকে সহজেই হাতে রাখা যাইতে পারে। 'এম' আমার কাছে প্রায়ই আসা-যাওয়া করিত। লোকটিকে আমার বেশ ভালও লাগিত। পৃথিবীর অনেক কিছু সে দেখিয়াছে—অনেক কাহিনী, অনেক গল্প, অনেক কুৎসা তাহার জানা ছিল; বেশ ফলাও করিয়া তাহার বর্ণনাও করিতে পারিত। কাবুলের বাজারে কখন কি হইতেছে না হইতেছে, সে সম্বন্ধে সমস্ত টাট্‌কা খবর সে আমাকে দিত। এক দিন তাহাকে আমার সহিত দোকানে দেখা করিতে বলিলাম। তাহার পর কথাপ্রসঙ্গে বিষয়টা তাহার নিকট ক্রমশঃ ব্যক্ত করিতে লাগিলাম। প্রথমেই বলিলাম—হ্যাঁ হে 'এম', আফগানিস্থানের কোন্ কোন্ জায়গা তুমি দেখিয়াছ?

এম উত্তর করিল—প্রায় সবটাই দেখিয়াছি। আফগানিস্থানে যাহার একটা লরী থাকে সে সব জায়গাই দেখিতে পারে। আমি ফতুরে গিয়াছি, গজনী, জালালাবাদ, মোজার শরিফ, আনখৈ,—সব জায়গায়ই গিয়াছি। বিড়বিড় করিয়া সে আরও গোটা ছয়েক জায়গার নাম করিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—বাদাকসানে কখনও গিয়াছ কি?

সে উত্তর করিল—আলবৎ গিয়াছি। এমন কি হ্যাঙ্গো নদীও দেখিয়া আসিয়াছি। ঐ নদীটার ওপারেই রাশিয়া।

আমি—আচ্ছা, হ্যাঙ্গো নদীটা আনখৈর দিকে গিয়াছে না?

এম—হ্যাঁ, ঐ নদীটাই তো আনখৈর দিকে গিয়াছে।

আমি—ওখানটায় যাহারা থাকে তাহারা নিশ্চয় নদী পারাপার হইয়া রাশিয়ায় যাতায়াত করে?

এম—অনেকে গোপনে রাশিয়ায় যাইয়া সোনা লইয়া আসে। জানেন, আফগান সরকার কারাকালি ভেড়ার চাষের রপ্তানি নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ওখানে ওই চাষের চোরা-কারবার বরাবরই চলিতেছে। নদীটার আফগানী পারে দাঁড়াইয়া আমি অনেকবার রাশিয়ার পারের ব্যাপার দেখিয়াছি। ওখানে আমার এক জন বন্ধু আছেন। তিনি চোরাই মালের কারবার করিয়া থাকেন। তিনি অনেকবার রাশিয়ায় গিয়াছেন।

আমি বলিলাম—তাহা হইলে দেখিতেছি, কেহ যদি রাশিয়ায় যাইতে চাহে তবে তাহাকে যখন খুসী সেখানে গোপনে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এম—এ আর এমন শক্ত কথা কি—আপনি যাইতে চান? আমি আপনাকে পৌঁছিয়া দিব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম—না, আমি যাইব না। সেখানে গিয়া আমার কি কাজ? আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম। আচ্ছা বলিতে পার, রুশ সীমান্তে যাইবার কোন্ কোন্ পথ আছে?

এম—খানাবাসার মধ্য দিয়া, পীর সাহেবের দরগা দিয়া যাওয়া যায়। পীর সাহেবের দরগা হ্যাঙ্গো নদীর খুব কাছে।

আরেকটা পথ আছে, সে পথে গেলে বুখো দিয়া যাইতে হয়। বুখো সীমান্তের দশ বার মাইল আগে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—নদীর উপর দিয়া কোন সেতু আছে কি? অথবা নৌকা পাওয়া যায় কি? লোকেরা কি করিয়া সেখানে নদীর অপর পারে যায়?

এম—একটা সেতু আছে বটে, কিন্তু ছাড়পত্র ছাড়া উহার উপর দিয়া নদী পার হওয়া মুস্কিল। যাহারা চোরাই মালের কারবার করে, তাহারা কতকগুলি "মশক" (ভিস্তিওয়ালারা যে চামড়ার থলিতে করিয়া জল নেয়) বাতাসে ফুলাইয়া এক সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধে। তারপর তার উপর একটা মাছ-ধরা জাল পাতিয়া দেয়। কোন মতে তার উপর বসা চলে।

আমি—উহাতে ধরা পড়িবার খুব সম্ভাবনা নাই কি?

এম—লোকে ত বরাবরই এখানে নিজেরাও পারাপার হইতেছে, চোরাই মালও পারাপার করিতেছে। কেহ কোন দিন ধরা পড়িয়াছে বলিয়া ত শুনি নাই।

শেষকালে আমি বলিলাম—এত কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন জান? শীঘ্রই আমার একজন বন্ধু এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন। তাঁহার কাছে ছাড়পত্র নাই। তাঁহাকে পার করিয়া দিয়া আসিতে পারিবে কি? তুমি বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই কথাটা তোমাকে বলিলাম। এ সব বিষয়ে আমি ওয়াকিফহাল নহি, তাই তোমার পরামর্শ চাহিতেছি।

এম আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিল—কোন চিন্তা করিবেন না; আপনার বন্ধুকে খবর পাঠাইয়া দিন, তিনি এখানে চলিয়া আসুন। এ কাজটুকু করিয়া দিতে আমার চেয়ে বিশ্বস্ত লোক আপনি কোথায় পাইবেন ?

আমি—আরে সে ত জানিই, তুমি যে এক জন তুখড় লোক তাহা আর বলিতে হইবে না। তবে কিনা এ কাজটা যত সহজ মনে করিতেছ ততো সহজ নহে। সব কিছু গোপনে করিতে হইবে। কেহ যেন উহা কিছুই না জানিতে পারে। এ সব ব্যাপারে সব সময়েই একটা বিপদ ঘটিবার সম্ভবনা। রাশিয়ায় পাড়ি দিবার পূর্ব্বে আমার বন্ধু যাহাতে কোন রকম হাঙ্গামায় না পড়েন, সে বিষয়ে সকলেই অত্যন্ত হুঁসিয়ার থাকিতে হইবে। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, আমার বন্ধুর সর্ব্বনাশ হইবে। তুমি যদি তাঁহার সহিত ধরা পড়, তাহা হইলে হয়ত জীবনের বাকী কালটা তোমাকেও জেলে কাটাইতে হইতে পারে।

সে উত্তর করিল—কোন চিন্তা করিবেন না। খোদার উপর বিশ্বাস রাখুন। খোদার ফজলে আপনার বন্ধুর কোন অনিষ্ট হইবে না।

আমি—আচ্ছা, তবে আমি তাঁহাকে এখানে আসিবার জন্য খবর পাঠাইয়া দিই। আচ্ছা, বল ত কি করিয়া তুমি তাঁহাকে পার করিয়া দিবে ?

সে বলিল—আপনার বন্ধু পার্শী বা পুস্তু জানেন কি ?

আমি উত্তর করিলাম—এদেশের কোন ভাষা তিনি জানেন বলিয়া মনে হয় না। তবে আমার মনে হয়, একটা কাজ করিতে তিনি পারিবেন। পুস্তু বা পার্শী জানেন এমন একটি লোককে তিনি সঙ্গে আনিতে পারেন।

সে উত্তর করিল—তাহাতেই চলিবে। যে লোকটা পার্শী বা পুস্তু জানে, তাহাকে আমি একজন হাজী সাজাইয়া লইব। তাহার পর আমরা উজবেগের ছদ্মবেশ ধরিয়া নজর শরীফে তীর্থযাত্রীর মত যাইব। নজর শরীফে এক রাত থাকিয়া পর দিন বুখো রওনা হইব। বুখোর কিছু কাছেই আমার একজন বন্ধু আছেন, তিনি রাশিয়ানদের সঙ্গে কারবার করেন। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাহার পর যাহা কিছু করিবার তাহা তিনিই করিবেন।

আমি বলিলাম—বেশ, এ ব্যবস্থা ভালই। আমিও ঐরূপ কিছুই ভাবিতেছিলাম। কিন্তু আমার বন্ধুকে উজবেগের বেশে মানাইবে না। পাঠানের বেশেই তাঁহাকে মানাইবে ভাল, কারণ আমার বন্ধুর সঙ্গে যিনি যাইবেন, তিনি শুধু পুস্তুই বলিতে পারেন। তিনি যদি উজবেগী ভাষা বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে উজবেগী পোষাকও তাঁহাকে মানাইত। যাক, এজন্য খরচ কত পড়িবে বল ত?

সে বলিল—খরচ তেমন বেশী পড়িবে না। এই লরী ভাড়াটা লাগিবে আর পথের হাতখরচ যা সামান্য কিছু। আনখৈতে গিয়া ত একজন বন্ধুর লরীই থাকিবে, যাহার

জন্য একটা উপহার লইয়া গেলেই চলিবে। এক জোড়া চপ্পল আর একটা লুঙ্গি কিনিয়া লইয়া যাইব। এই ত মোটমাট মাত্র খরচ। তবে আমার নিজের ত কিছু চাই। জানেন ত, বড়ই কষ্টে দিন যাইতেছে। যাহাতে একটু ভাল রকম পাই, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন—এই টুকুই আমি আশা করি।

রফা

অমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, তোমার কত চাই? কত হইলে তুমি খুসী হও?

সে উত্তর দিল—যা ভাল মনে করেন। আমি নিজে ত মনে করি ছয়-সাত শত আফগানী টাকার কম হওয়া উচিত নয়।

আমি—আচ্ছা, সাত শত আফগানীই তোমাকে দিব। তবে একটা কথা আছে, এক সঙ্গে তোমাকে সমস্ত টাকা দিব না,—প্রথমে তিন শত আফগানী দিব, তাহার পর যখন তুমি আমার বন্ধুর নিকট হইতে চিঠি লইয়া আসিতে পারিবে যে, তিনি নির্ব্বিঘ্নে আফগান সীমান্ত পার হইয়া গিয়াছেন, তখন বাকী টাকা দিব।

এম বলিল—এখন দুই শত আফগানী দিলেও আমার আপত্তি নাই। পরে রসিদ-চিঠা দেখাইয়া পাঁচ শত আফগানী লইব।

লোকটার কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া খুব আশ্বস্ত হইলাম। বলিলাম—তা তোমার যেমন খুসী। কাল হইতে প্রত্যহ

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। অনেক বিষয়ে হয়ত তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

এম আমাকে সেলাম করিয়া সেদিনকার মত বিদায় লইল।

এম-এর সঙ্গে আমার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইল, রাত্রিতে আমি তাহা বোসবাবুকে বলিলাম। তিনি 'এম' সম্পর্কে সমস্ত কথা খুঁটিনাটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যাহা জানিতাম তাহা সমস্তই তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। বোসবাবু বলিলেন—এ রকম লোকই আমাদিগকে চোরাই পথে রাশিয়ায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। বিপদে ফেলিবার মত লোক ইহারা নহে।

রহমৎ খাঁ বাজার হইতে আফগানিস্থানের মানচিত্র কিনিয়া আনিয়াছিলেন। মানচিত্র খুলিয়া দেখিলাম যে, রাশিয়ায় পৌঁছিবার জন্য 'এম' ঠিক পথই বর্ণনা করিয়াছে। বোসবাবু দুই-তিন দিনের মধ্যেই কাবুল ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন।

রহমৎ খাঁ ঠিক করিলেন যে, 'এম' লোকটা কেমন তাহা জানিবার জন্য তিনি নিজে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমিও স্বভাবতঃই সব দিক দিয়া হুঁসিয়ার হইতে চাহিয়াছিলাম। আমার ভাবনা ছিল যে, যদি বোসবাবুর কোন বিপদ হয় তাহা হইলে সারা জীবন আমাকে লজ্জায় কাটাইতে হইবে। কাজেই রহমৎ খাঁ ও এম-এর সাক্ষাৎকার করাইয়া দিব বলিয়াই কথা দিলাম।

পরদিন সকাল দশটার সময় "'এম'" আমার দোকানে আসিবে বলিয়া কথা ছিল। সুতরাং, আমি রহমৎ খাঁকে এগারোটার সময় আসিয়া দেখা করিতে বলিলাম। 'এম'কে বলিয়াছিলাম, যে দুই জন বন্ধুকে রুশ-সীমান্ত পার করিয়া দিয়া আসিতে হইবে, তাহাদের একজন কাবুলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি তোমার কথা বলিয়াছি। তিনি তোমার সহিত দেখা করিতে চাহেন, এবং যে-কোন সময় আসিয়া পড়িতে পারেন। তিনি আসিলে তোমরা দুই জনে তোমাদের যাওয়ার একটা ব্যবস্থা ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। টাকার কথা ভাবিও না। টাকা যাহা লাগিবে তাহা যোগাড় করিতে আমি চেষ্টা করিব।

আমরা যে সময় এই সকল কথা বলিতেছিলাম, ঠিক সেই সময় আমার দোকানের বিপরীত দিকে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। গাড়ীতে ছিলেন সেনোরা কারোনি। গাড়ী হইতে নামিয়াই তিনি সোজা আমার দোকানে ঢুকিলেন। পূর্ব্বে তিনি একখানি বড় হল্‌দে রঙের গাড়ীতে আসিতেন। কিন্তু আজ যে গাড়ীতে আসিলেন সে গাড়ীখানা অত্যন্ত ছোট এবং তিনি নিজেই গাড়ীখানি চালাইয়া আসিয়াছেন। দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম।

সেনোরা কারোনি মিঃ বোসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম যে, তিনি অপেক্ষা করিতে করিতে বিরক্ত

হইয়া উঠিয়াছেন।' উপস্থিত তাঁহার সন্দেহ হইতেছে যে, হয়ত তাঁহার পলায়নের আদৌ কোন ব্যবস্থা হইবে কিনা।

একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—না না, সন্দেহের কোন কারণ নাই। আমরা যতদূর পারি চেষ্টা করিতেছি। বার্ত্তাবাহকদের সম্বন্ধে আমরা রোমে কয়েকটি তার পাঠাইয়াছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন উত্তর পাই নাই। কেন যে এত দেরি হইতেছে, বুঝিতেছি না। এখনকার ভারপ্রাপ্ত দূতও খুবই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মিঃ বোসকে বলিবেন, তিনি যেন কোন দুশ্চিন্তা না করেন। আর কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া যাইবে।

আমি বোসবাবুর একখানা পত্র তাঁহার স্বামীকে দিবার জন্য কারোনির হাতে দিলাম। তিনি পত্রখানি লইয়া আমায় বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন।

এগারোটা পনেরো মিনিটের সময় রহমৎ খাঁ আমার দোকানে আসিলেন। আমি তাঁহাকে এম-এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলাম। দোকানে বসিয়া এই সমস্ত কথা আলোচনা করা ঠিক নহে। এই জন্য তাঁহারা কোন উপযুক্ত স্থানে বসিয়া আলোচনা করিবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিলে রহমৎ খাঁ আমাকে বলিলেন যে, 'এম' তাঁহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে বসিয়া তাঁহারা যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছেন। রহমৎ খাঁ বলিলেন—আমি 'এম'কে বলিয়া দিলাম যে,

অপর যে বন্ধুটির আমাদের সহিত যাইবার কথা আছে—তিনি দুই তিন দিনের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিবেন, এবং যে দিনই আসিয়া পৌঁছিবেন তাহার পরের দিনই আমাদিগকে রওনা হইতে হইবে।

তারপরের দিন খুব সকালেই 'এম' আমার দোকানে আসিয়া পৌঁছিল এবং রহমৎ খাঁ ও সে মিলিয়া যে ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছে তাহা আমাকে বলিল। আমি তাহাকে কিছু টাকা দিলাম, এবং সেই টাকা দিয়া তাহার আনখৈর বন্ধুর জন্য একজোড়া চপ্পল ও একটি লুঙ্গি কিনিতে বলিলাম।

বিকালের দিকে সেদিন আর একটা সমস্যা দেখা দিল। পেশোয়ারের এক বন্ধু আমার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই দিনই তিনি পেশোয়ার হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জীবনলাল। তিনি মেওয়ার কারবার করিতেন। প্রতি বৎসরই মরশুমের সময় পাইকারী কেনাকাটির জন্য কাবুলে আসিতেন।

কথায় কথায় আমি জীবনলালকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ভারতবাসীরা ভারতবর্ষ হইতে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান সম্পর্কে কি মনে করে। জীবনলাল লেখাপড়া জানিত না, রাজনীতি লইয়াও খুব কম মাথা ঘামাইত। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের ব্যাপারটা এমনই চাঞ্চল্যকর যে, ভারতের সকলেই সে কথা লইয়া আলোচনা করিত। জীবনলাল বলিল, আমার নিজের ধারণা, ইংরাজেরা তাঁহাকে

কোন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এবং উক্ত ব্যাপার লইয়া মিথ্যা প্রচার করিতেছে যে, তিনি অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। ইঁহাতে সহজেই লোকে মনে করিবে যে, তিনি একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এদিকে ইংরেজরা তাঁহার প্রতি যাহা খুসী তাহাই করিতে পারিবে।'

দোকান বন্ধ করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি জীবনলাল যাহাতে এখান হইতেই বিদায় গ্রহণ করে তাহার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে উঠিবার কোন লক্ষণই দেখাইল না; তখন আমি দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ীর দিকে পথ ধরিলাম। জীবনলালও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আগে আগে যখনই সে এখানে আসিত তখনই আমি তাহাকে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতাম। হয়ত সে মনে করিয়াছিল, এবারও পূর্ব্ব ঘটনাই পুনরাবৃত্তি হইবে। কিন্তু এবার আমার পক্ষে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিবার কোন প্রকার উপায়ই ছিল না। সুতরাং, কথায় কথায় আভাসে-ইঙ্গিতে আমি তাহাকে এই বলিয়াই বোঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, আজকাল আমার খাওয়া-দাওয়ার বড়ই অসুবিধা হইয়াছে, কারণ বাড়ীতে আমার স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতা —অধিকাংশ সময় বাজার হইতে খাবার আনাইয়া খাইতে হয়। জীবনলাল ইঙ্গিতটা বুঝিল। বাড়ীর কাছে আসিলে, মৌখিক ভদ্রতারক্ষার জন্য আমি তাহাকে এখানেই আহার করিয়া যাইতে বলিলাম। সে অসম্মতি জানাইয়া

বলিল যে, তোমার স্ত্রী অসুস্থা—এ অবস্থায় তোমাকে বিব্রত করা আমার উচিত নহে।

সেদিনটা এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

পরের দিন যাত্রা সম্পর্কে অন্যান্য কথার বিস্তারিত আলোচনার জন্য রহমৎ খাঁ এম-এর সহিত দেখা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। দোকান খুলিবামাত্রই 'এম' আসিয়া হাজির হইল এবং রহমৎ খাঁর কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাঁহাকে রহমৎ খাঁর জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলাম। ইতিমধ্যে জীবনলালও আসিয়া উপস্থিত হইল। 'এম'কে সে পূর্ব্ব হইতেই চিনিত। দুই জনে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। এমন সময় রহমৎ খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রহমৎ খাঁ জীবনলালকে দেখিবামাত্রই আমার সহিত অপরিচিতের মত ব্যবহার করিলেন এবং 'আসলাম আলাইকুম' বলিয়াই এম-এর সহিত চলিয়া গেলেন।

জীবনলাল খুব ভাল করিয়াই জানিত যে, 'এম' একটা ঝানু জুয়াড়ী। কিন্তু রহমৎ খাঁ সম্পর্কে সে কুতূহলী হইয়া উঠিল, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—ও লোকটি কে? আমি সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, পূর্ব্বে উহাকে দেখি নাই; সম্ভবতঃ এম-এর কোন বন্ধু-বান্ধব হইবে। জীবনলাল ঈষৎ যেন চিন্তান্বিত হইয়াই বলিল, খুব সাবধান, কোন রকমেই এম-এর সংস্পর্শে যাইও না—লোকটা ঝানু জুয়াড়ী।

অপর লোকটাকেও জুয়াড়ী বলিয়াই মনে হয়। একদিন হয়ত টাকাকড়ির ব্যাপারে তাহারা তোমাকে ঠকাইয়া ছাড়িবে।

আমি উত্তরে বলিলাম—আমার জন্য তোমাকে ভাবনা করিতে হইবে না।

দুপুর নাগাত জীবনলাল চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই রহমৎ খাঁ এবং 'এম' আবার ফিরিয়া আসিল। রহমৎ খাঁ বলিলেন—আমরা বাহিরে যাইয়া একজোড়া চপ্পল এবং একটা লুঙ্গি কিনিয়া আনিয়াছি। তারপর মাজার শরীফের দিকে কখন লরী ছাড়ে তাহারও খোঁজ-খবর লইবার জন্য সরাইয়ের নিকটস্থ লরী ষ্ট্যাণ্ডে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, আজই একটা লরী ছাড়িয়া গিয়াছে; পুনরায় আর একটা ছাড়িবে তিন দিনের মধ্যে।

জীবনলালের সন্দেহ

সে দিন আমি এম-এর হাতে একখানা এক শত টাকার নোট দিতে যাইব এমন সময় জীবনলাল আসিয়া উপস্থিত। 'এম'কে এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারে সে অহেতুক গরম হইয়া উঠিল এবং 'এম' ও রহমৎ খাঁর সম্মুখেই আমাকে প্রায় ধমকাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। এবং আরও বলিল—তোমাকে না এ সমস্ত জুয়াড়ীর হাতে পড়িবার পূর্বে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম? দেখিতেছি তাহার কোন ফলই হয় নাই। সে যাহা হউক, উপস্থিত তোমার যাহা

খুসী তাহাই কর। তোমার ভালমন্দ তুমিই নিজেই ভাল বোঝ। আমি তোমার বন্ধু, তাই সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম।

'এম' এবং রহমৎ খাঁ উভয়েই জীবনলালের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হইয়া ধাঁ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু জীবনলাল বকিয়াই যাইতে লাগিল। সে ধরিয়াই লইয়াছিল যে, রহমৎ খাঁ-ও একটা জুয়াচোর। ঘটনাটায় আমি বেশ খানিকটা বিব্রতই হইয়া পড়িলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আসলে রহমৎ খাঁ কে, এ-কথা জীবনলালকে বলিব কি বলিব না? বুঝিলাম, সত্য কথা না বলিলে বিপদ। রহমৎ খাঁ আমার বাড়ীতে থাকিতেন। যে বাড়ীতে জীবনলাল থাকিত সে বাড়ীটা আমার দোকানে যাইবার পথে পড়ে। হয়ত সেখানে জীবনলাল রহমৎ খাঁকে আমার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে দেখিতে পাইবে, এবং তাহা হইলেই তাহার মনে আরও সন্দেহ জাগিবে। আমি ভাবিলাম, আসল কথা যদি উহাকে খুলিয়া না বলি, তাহা হইলে সে হয়ত কাবুলস্থ অন্যান্য ভারতীয়ের নিকট এই দুইজন জুয়াড়ীর সহিত আমার সংস্রব রাখার কথা লইয়া আলোচনা করিবে এবং তাহাদিগকে হয়ত রহমৎ খাঁকেও দেখাইয়া দিবে।

এদিকে মিঃ 'আর'ও রহমৎ খাঁকে আমার বাড়ীতে দেখিয়াছে। সুতরাং সকল কথাই ফাঁস হইয়া পড়িবে। তাছাড়া জীবনলালও অনবরত আমার দোকানে বসিয়া থাকে, অতএব কোন কাজ করাই আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

অগ্রপশ্চাৎ সমস্ত কথা বিবেচনা করিবার পর আমি জীবনলালকে বলিলাম—উহাদের সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া উহাদিগের সম্মুখেই, তোমার জুয়াড়ী বলাটা সঙ্গত হয় নাই স্বীকার করি 'এম' একজন জুয়াড়ী। কিন্তু এই নবাগত ভদ্রলোকটি সম্পর্কে তুমি কি জান? আমাকে একশত টাকার একখানি নোট দিতে দেখিয়াই কেন তুমি এ ধারণা করিয়া ফেলিলে যে, লোকটা একটা প্রবঞ্চক?

জীবনলাল উত্তর দিল—প্রথম যেদিন 'এম'কে দেখিয়াছিলাম, সেদিনই জানিয়াছিলাম যে সে একজন জুয়াড়ী তাহার বন্ধুকেও জুয়াড়ীর মতই দেখায়। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা তোমার ভালর জন্যই বলিয়াছিলাম তবে তুমি যদি বিরক্ত হও, ভবিষ্যতে তোমার ব্যাপারে আর আমি মাথা ঘামাইব না। তোমার মন যাহা চায় তাহাই কর।

আমি বলিলাম—আমার ব্যাপারে মাথা ঘামান বা না-ঘামান সে তোমার ইচ্ছা। কিন্তু তুমি একজন ভদ্রলোককে অপমান করিতে গেলে কেন?

জীবনলাল পাল্টা জবাব দিল—তুমিই না বলিয়াছিলে যে ঐ নূতন লোকটিকে তুমি চেন না? আর এখন বলিতেছ, তিনি একজন ভদ্রলোক। এখন দয়া করে বল, শুনি লোকটা কে? আর কেনই বা তুমি তাহাকে একশত টাকার একখানা নোট দিয়াছিলে?

আমি সহাস্যে বলিলাম—প্রথম দিকে তাঁহার সম্বন্ধে তুমি কিছু জানিতে পারো এই ইচ্ছা আমার ছিল না। সে জন্যই আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি তাঁহাকে চিনি না। টাকাটা দেওয়ার আমার অন্য একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্যের কথা তোমার জানিবার কোন দরকার নাই। এই জন্যই কেন তাহাকে টাকা দিয়াছিলাম, তাহা তোমাকে বলিতে চাহি না।

জীবনলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—এতদিন ত তুমি কখনো আমার কাছে কোন কথা গোপন কর নাই। এখন যখন আমার কাছেও গোপন করিতেছ তখন হয়ত কথাটা অতিশয় গোপনীয়ই।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ, তাই। কথাটা অতিশয় গোপনীয়ই। তাছাড়া তোমাকে কথাটা বলিলে আমার ভীষণ ক্ষতি হইতে পারে; আর জানিলেও তোমার কোন লাভ হইবে না। সবার উপর বড় কথা হইতেছে এই যে, উহার সহিত তোমার কোনই সম্পর্ক নাই।

ইহাতে জীবনলালের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। সে কখনও আমাকে বিপদে ফেলিবে না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, গোপন কথাটি তাহার নিকট ভাঙ্গিয়া বলিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। আমি বলিতে বাধ্য হইলাম, আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি—কাল তোমাকে যাহা হয় বলিব।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরিবার পর কথাটা বোসবাবুকে বলিলাম। তিনি জীবনলাল সম্পর্কে বিস্তারিত অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর বলিলেন—লোকটা নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বল-হৃদয়। এমন লোককে কখনও বিশ্বাসের মধ্যে লইতে নাই।

আমি যখন তাঁহাকে বলিলাম যে, কথাটা গোপন রাখিলে বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে তখন বোসবাবু বলিলেন—আপনি যাহা ভাল বোঝেন তাহাই করুন। কিন্তু আমি আপনাকে কথাটা প্রকাশ না করিতেই পরামর্শ দিতেছি। আর খুব বেশী হইলে, মাত্র দুইদিন আমি এখানে আছি। আমি চলিয়া গেলে পর, ইচ্ছা হইলে আপনি তাহার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিতে পারেন।

আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত এক মত হইলাম। রহমৎ খাঁকে বলিলাম, তিনি যেন 'এম'-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত আমার দোকানে না যাইয়া অন্য কোন জায়গায় দেখা-শুনা করিবার ব্যবস্থা করেন।

পরদিন জীবনলাল আবার আমার দোকানে আসিয়া গোপন কথাটা কি তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, আমার স্ত্রীর অসুখের দরুণ কথাটা তোমার নিকট প্রকাশ করা সম্বন্ধে এখনও ভাবিয়া দেখিতে পারি নাই।

এই ধরণের নিরস উত্তর পাইয়া জীবনলাল সে সময় আর কিছু উচ্চবাচ্য করিল না। কিন্তু তাহার মুখে স্পষ্ট ক্রোধের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া জানিলাম, রহমৎ খাঁ আগামী কালের পর দিন কাবুল ত্যাগ করিবার সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া আসিয়াছেন। কেবলমাত্র লরীতে সিট্ রিজার্ভ করিতেই যা বাকী।

পরদিন প্রাতে সবেমাত্র দোকানে পৌঁছিয়াছি এমন সময় জীবনলালও দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল। আমি তাহাকে বলিলাম—উহা লইয়া দুশ্চিন্তা করিও না। জানিয়া রাখ যে, কথাটা আমি তোমার নিকট গোপন রাখিব না।

অবশেষে ইতালীয়দের চিঠি

আমরা দোকানে বসিয়া যখন এই সকল কথা বলিতেছি, ঠিক সেই সময় সেনোরা কারোনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমার হাতে একখানা লেফাফা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া খুব উৎফুল্ল মনে হইল। তিনি যখন লেফাফাখানি আমার হাতে দেন তখন জীবনলালের দৃষ্টি তাহা এড়ায় নাই। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত খুসীর কারণ কি? তিনি বলিলেন—পত্রখানা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সব ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে কি?

হ্যাঁ, সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র এই কথা বলিয়াই সেনোরা কারোনি চলিয়া গেলেন।

সেনোরা কারোনির আগমনের ফলে জীবনলালের কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। সব কথা জানিবার জন্য সে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সেনোরা কারোনি সম্পর্কে সে আমাকে অনেক জেরা করিল এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিল—ঐ স্ত্রীলোকটি যে তোমার হাতে একখানা সাদা কাগজ দিয়া গেলেন, তাহা কি? অমি বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ সাদা কাগজ? তিনি ত আমাকে ঐরূপ কোন কাগজ দেন নাই। তুমি জাগিয়া আছ না ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছ?

জীবনলাল উত্তর করিল—আমি স্বপ্নও দেখি নাই বা নেশার প্রভাবেও কিছু বলি নাই। কিন্তু এবার এখানে আসার পর হইতেই দেখিতেছি তুমি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছ। তুমি যে-সব কাজ করিতেছ তাহার কিছুই আমার বোধগম্য হইতেছে না। তুমি বড়ই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছ।

পাল্টা জবাবে আমি বলিলাম—আমি আগে যাহা ছিলাম, এখনও তাহাই আছি। তোমাকেই যেন একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ছুটিতে দেখিতে পাইতেছি। জীবনলাল অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং কয়েক মিনিট পরেই দোকান হইতে উঠিয়া গেল।

মনে মনে ভগবানকে আমি ধন্যবাদ দিলাম। ইতালীয় দূতের নিকট হইতে যে চিঠিখানি আসিয়াছিল, তাহা পড়িবার জন্য আমি অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলাম।

চিঠিখানির বক্তব্য হইতেছে এই—অনেক দিন আপনাকে কোন চিঠি পাঠাই নাই। কিছু জানাইবার ছিল না বলিয়াই কোন চিঠি পাঠান হয় নাই। আজ রোম হইতে একটা সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গিয়াছে। বার্ত্তাবাহকগণ রোম ত্যাগ করিয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। ছাড়-পত্রের জন্য আপনার একখানা ফটো চাই। আগামী কল্য এগারোটার পর অনুগ্রহ করিয়া দরাব মেন রোডে আসিবেন। সেখানে দেখিবেন, একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। (গাড়ীখানির নম্বর···) গাড়ীতে এক জন লোক দেখিতে পাইবেন। তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিবেন। গাড়ীখানি আপনাকে একটি নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবে। সেখানে আপনার ফটো লওয়া হইবে। ফটো লওয়া হইয়া গেলে পর, পুনরায় গাড়ীখানি আপনাকে যেখান হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল সেইখানেই ছাড়িয়া আসিবে। ফটোগ্রাফের জন্য আপনাকে কোন খরচ দিতে হইবে না।

চিঠিখানি পড়া শেষ হইয়াছে এমন সময় 'এম' আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহার এবং রহমৎ খাঁর সঙ্গে যে বন্ধুর যাওয়ার কথা আছে তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন কিনা?

আমি বলিলাম—এখন পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছান নাই। তবে সন্ধ্যার মধ্যে আসিয়া পড়িবেন বলিয়া আশা করা যায়। তিনি খবর পাঠাইয়াছেন যে, পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে।

'এম' বলিল, 'তিনি যদি এখনই আসিয়া না পৌছেন তাহা হইলে কাল রওনা হওয়া মুস্কিল হইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন?

উত্তরে সে বলিল—কাল যদি রওনা হইতে হয় তাহা হইলে আজই লরীর টিকেট করিয়া রাখিতে হইবে। আজকাল লরীর সংখ্যা অনেক কম, অথচ যাত্রী অনেক বেশী।

আমি—তাহাতে কিছু যায় আসে না। তিনি এখন অসুস্থ। আসিবামাত্রই যে আবার যাত্রা করিতে পারিবেন, তাহা আমার মনে হয় না। কাবুলে তাঁর উপস্থিতির পর যাহা হয় পাকাপাকি ঠিক করা যাইবে।

অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া ইতালীয় দূতের চিঠিখানি আমি বোসবাবুকে দিলাম। তিনি চিঠিখানি পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কি করা ভাল মনে করি।

আমি বলিলাম—ইতালীয়ানদের জন্য অপেক্ষা করিবেন, না 'এম'-এর সঙ্গে যাইবেন, যাহা ভাল বোঝেন আপনিই ঠিক করুন। 'এম'-এর সঙ্গে যাইতে হইলেও আপনাকে তিন দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

বোসবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

উত্তরে আমি বলিলাম—আজ যদি লরীতে সিট রিজার্ভ করা যাইত তাহা হইলে কাল রওনা হইতে পারিতেন; কিন্তু এই চিঠি পাওয়ার পর আমরা আর সিট রিজার্ভ করি নাই।

বোসবাবু বলিলেন—কাজটা ভালই করিয়াছেন। যদি আরও তিন দিন আমাদিগকে এখানে থাকিতেই হয় তাহা হইলে ইতালীয়দিগকে আমার ফটো দিতে আপত্তি নাই। দুইটা দিকই আমাদিগের চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রচুর অবসর মিলিবে। ইতালীয়দিগের বার্তাবাহকদের আসিয়া পৌঁছিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে আরও দশ বারো দিন এখানে থাকিতে হইবে। তারপর তাহারা আসিয়া পৌঁছিলেও এই স্থান ত্যাগ করিতে তাহাদের তিন চার দিন সময় লাগিবে।

মাঝখানে বাধা দিয়া রহমৎ খাঁ বলিলেন—এখন এবিষয়ে আর কথা বলিয়া দরকার নাই। কোন্ পথ ধরিব তাহা ভাবিয়া দেখিবার জন্য তিন দিন সময় পাওয়া যাইবে।

আমি রহমৎ খানের কথায় সায় দিয়া বলিলাম—হ্যাঁ, বিষয়টা কালই চিন্তা করিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু এখন সমূহ মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে জীবনলালকে লইয়া। আজ যখন সেনোরা কারোনি আমার কাছে চিঠিখানি দেন তখন জীবনলাল তাহা দেখিতে পাইয়াছিল। এ সম্পর্কে সে আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতন করে। আমি যখন তাহাকে কিছু বলিলাম না, তখন সে রাগ করিয়া চলিয়া যায়। লোকটা একটা আস্ত বোকা ; সে আমাদের ক্ষতি করিতে পারে।

বোসবাবু বলিলেন, লোকটাকে বিশ্বাস করিয়া সব কথা খুলিয়া বলা আমি ভাল মনে করি না। কিন্তু আমাদিগকে

যখন আরও কয়েক দিন এখানে থাকিতেই হইবে, তখন আপনি যাহা ভাল বোঝেন তাহাই করুন। আপনি যদি মনে করেন যে, তাহাকে সব কথাই বলা উচিত তাহা হইলে বলুন।

পরদিন জীবনলাল আমার দোকানে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন সে কোথায় ছিল।

সে বলিল—যখন আপনি আমাকে কিছুই বলিবেন না তখন এখানে আসিয়া আর আমার লাভ কি? আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।

আমি—কোন নূতন প্রশ্ন না কি?

জীবনলাল—না, সেই পুরাতন প্রশ্ন। সেদিন 'এম' এর সঙ্গে যে লোকটা আসিয়াছিল তাহার সম্পর্কেই কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেছি। লোকটাকে সেদিন হিন্দু গুজারে দেখিলাম, সে কি আপনার বাড়ীতে গিয়াছিল?

উত্তরে আমি বলিলাম—মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি এ সম্পর্কে আর আমাকে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিবে না; কিন্তু আমার ভুল হইয়াছে। কথাটা আমাকে গোপন রাখিতে দিলেই ভাল করিতে। কিন্তু প্রতিদিনই তোমার সন্দেহ যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে তোমাকে না বলিয়া উপায় নাই। কিন্তু এই কারণে তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, ব্যাপারটা একটা রাজনৈতিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে গেলে হয় তো তোমাকেও জেলে

াইতে হইতে পারে। রাজনীতিতে যখন তোমার কোন
াগ্রহ নাই, তখন এ সমস্ত বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করাই
তামার পক্ষে মঙ্গল। এ সমস্ত কথা আলোচনা করিলে
ামাদের উভয়েরই ক্ষতি হইতে পারে। আসল কথা কি
ান? তোমার কাছে কথাটা বলিতে ভয় হয়। কোন দিন
য়তো অসাবধানে অন্যত্র কথাটা তুমি প্রকাশ করিয়া দিবে।

জীবনলাল আশ্বাস দিল যে, কস্মিন কালেও সে কথাটা
াহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। এই জন্য যে কোন কষ্ট
ীকার করিতে সে প্রস্তুত, এমন কি সে জেলে যাইতেও
রোয়া করিবে না।

অবশেষে আমি বলিলাম—বোসবাবু আমার বাড়ীতেই
াছেন। আর অপর লোকটি যাহাকে তুমি 'এম'-এর
ঙ্গে দেখিয়াছ তিনি বোসবাবুরই সঙ্গী।

জীবনলাল সবিস্ময়ে বলিল—তাহা কি করিয়া সম্ভব?

সে সমস্ত কাহিনীটা শুনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে
াগিল।

আমি যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে ঘটনাটি তাহাকে বলিলাম।

সমস্ত কথা শুনিয়া সে উৎসাহিত হইয়া বলিল—এখন
একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে চাই।

আমি বলিলাম—তুমি যে তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিবে
াহা আমি জানি, এবং সেই জন্যই তোমাকে বিশ্বাস করিয়া
সমস্ত খুলিয়া বলি নাই। তাঁহার ন্যায় একজন স্বনামধন্য

কীর্ত্তিমান মানুষকে যে কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য করা যায় কি করিয়া? তুমি যদি এ সম্বন্ধে চুপচাপ থাক, তাহা হইলেই ভাল হয়। তিনি যদি জানিতে পারেন যে, তাঁহার কথা আমি তোমাকে বলিয়াছি, তাহা হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন না।

কিন্তু জীবনলাল একেবারে নাছোড়বান্দা। সে ধরিয়া বসিল, আমাকে কথা দিতে হইবে যে, বোসবাবুকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজী করাইবার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিব।

সে দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমরা আলোচনা করিলাম —ইতালীয়দের সহায়তায় আফগানিস্থান ত্যাগ করাই ভাল, না 'এম' এর সহায়তায় রাশিয়ায় পার হইয়া যাওয়া ভাল।

আগে যখন এ বিষয়ে কথা উঠিত তখন সুভাষবাবু বলিতেন—আমি মস্কো ছাড়া অন্য কোথায়ও যাইতে চাহি না। কিন্তু সেদিন রাত্রে বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি তাঁহার মত কিছুটা বদলাইয়াছেন। সেদিন রাত্রে কোন সিদ্ধান্ত না করিয়াই আমরা আলোচনা পরদিন রাত্রি পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিলাম।

পরদিন প্রাতে বোসবাবু ফটোগ্রাফ তোলাইবার জন্য রহমৎ খানের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারা বিকাল দু'টার সময় আমার দোকানে ফিরিয়া আসিলেন। আমি

বোসবাবুকে বলিলাম যে, হাজি সাহেব তাঁহাকে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ; সাড়ে চারটার সময় আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইবে। এখনও দুই ঘণ্টা সময় আছে। তাঁহারা এই সময়টা ইচ্ছা করিলে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন। তাহার পর যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেলেই চলিবে। 'আমি বলিলাম, আমি যদি অবসর করিতে পারি, তাহা হইলে আমিও আপনাদিগের সঙ্গে যাইব।

বোসবাবু ও রহমৎ খাঁ উভয় যথা সময়ে হাজি সাহেবের বাড়ী পৌঁছিলেন। আমি তাঁহাদের সহিত যাইতে পারি নাই। পরে যখন সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম যে, বোসবাবু হাজি সাহেবের স্ত্রীর সহিত জার্ম্মাণ ভাষায় কথা বলিতেছেন। চা খাওয়ার পর সন্ধ্যার দিকে সকলে এক সঙ্গে বাড়ী ফিরিলাম।

নেতাজী ইতালীয়দিগের সহিত যাইবেন কি 'এম'-এর সঙ্গে যাইবেন, এই প্রশ্ন সেদিন আবার আলোচনা হইতে লাগিল। আমি এবং রহমৎ খাঁ শেষ পর্য্যন্ত এক মত হইয়া বলিলাম যে, 'এম'-এর সঙ্গে যাওয়াই ভাল।

রহমৎ খাঁ বলিলেন—সীমান্তের পথ যে বিঘ্নসঙ্কুল তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়তো বা আপনাকে দীর্ঘকাল রুশ কারাগারেও কাটাইতে হইতে পারে। কিন্তু সুবিধা এই, আপনি অন্ততঃ রাশিয়ায় পৌঁছিতে পারিবেন। তবে ইহাও সম্ভব যে, আপনি রাশিয়ায় আছেন এ কথা মস্কোর

কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে পাওয়া মাত্র হয়ত তাহারা আপনাকে মস্কোতে ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু ইতালীয়রা এই সঙ্কটকালে একবার আপনাকে হাতে পাইলে যে কি করিয়া হাতছাড়া করিবে তাহা আমি এখনও ঠিক করিতে পারিতেছি না।

বোসবাবুর সিদ্ধান্ত

বোসবাবু উত্তর দিলেন—ইতালী হইতে যে শেষ পত্র আসিয়াছে, যদি তাহা না আসিত তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই 'এম'-এর সহিত যাইতাম। এক্ষণে যখন ইতালীয়রা আমার ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক্‌ঠাক্ করিয়াছে তখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না। অধিকন্তু 'এম'-এর সঙ্গে যাওয়াটা অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল হইতে বাধ্য। হয়তো রুশ ভূমিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি গ্রেফ্‌তার হইতে পারি। যদি ইতালীয়দের সহিত যাইবার জন্য আমাকে আরও দশ দিন এখানে থাকিতে হয়, তাহা হইলে সেই দশ দিন অপেক্ষা করা সঙ্গত নহে কি? আপনাদের দুই জনের বিশ্বাস এই যে, ইতালীয়রা আমাকে মস্কো যাইতে দিবে না। আমি চাই যে, আপনারা মন হইতে এই ধারণা দূর করুন। আমি মস্কোতেই যাইতে চাহি। এখান হইতে মস্কো যাওয়া অপেক্ষা রোম বা বার্লিন হইতে মস্কো যাওয়া সহজতর হইবে। তারপর আর একটা গুরুতর কথাও বিবেচ্য। এখানকার রুশ দূত আমাকে

সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছেন। রুশ সরকারও তাঁহাদের দেশের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে দিবার অনুমতি দিতে সম্মত নহে। খুব সম্ভব হয়ত তাঁহারা আমাকে চাহেন না, কিম্বা হয়তো তাঁহাদের দেশে আমাকে থাকতে দিতে তাঁহারা রাজী নহেন। তবে আমি বার্লিনে বা রোমের রুশ দূতদের নিকট চেষ্টা করিয়া দেখিব, তাঁহারা আমাকে মস্কো পাঠাইতে পারেন কি না। যদি তাঁহারা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাকে বাধ্য হইয়াই ইতালী বা জার্ম্মাণীতে থাকিতে হইবে।

রহমৎ খাঁও এই অভিমতের সহিত একমত হইয়া বলিলেন—কথাটা আপনি ঠিক বলিয়াছেন। যদি রাশিয়ানরা আপনাকে অবাঞ্ছিত লোক মনে করে তবে আপনি কি করিয়া রাশিয়ায় যাইতে পারেন?

ঠিক হইল যে, বোসবাবু চক্রশক্তির দেশেই যাইবেন। আমি বলিলাম যে, এখন যখন তুইটা পথের মধ্যে একটা পথ ঠিক করা হইল তখন 'এম'কে বুঝাইয়া বলা দরকার যে, তাহার সহিত যে ব্যবস্থা হইয়াছিল সেই ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দিতে হইল। কোনও ক্রমেই যাহাতে তাহার মনে কোনও সন্দেহের উদ্রেক না হয় তাহা দেখিতে হইবে। রহমৎ খানের আর তাহার সহিত দেখা সাক্ষাতের কোন দরকার নাই। পরদিন যখন 'এম' আসিবে তখন আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিব যে, যে বন্ধুটির আসার কথা ছিল

তিনি হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেজন্য রহমৎ খাঁনও চলিয়া গিয়াছেন; যখন তাঁহারা দুই জনই ফিরিয়া আসিবেন তখন আবার কথাবার্ত্তা হইবে। বোসবাবু ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

আবার কারোনি

পরদিন সকাল এগারটার সময় সেনোরা কারোনি আমার দোকানে আসিলেন। জীবনলালও ঠিক সে সময় আমার দোকানে উপস্থিত ছিল। সেনোরা কারোনি আমাকে একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন যে ফটোটি ঠিক উঠিয়াছে।

এতদিন আমি জীবনলালকে সেনোরা কারোনি সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। এখন তাঁহার সম্বন্ধে সব কথা জীবনলালকে বলিতে হইল।

সেনোরা কারোনি ইতালীয় দূতের নিকট হইতে যে শেষ চিঠি আনিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত ছিল বোসবাবুর ছাড়পত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এখন বার্ত্তাবাহকগণ আসিয়া পৌঁছিলেই হয়; তাহারা তিন চার দিনের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিবে, অতএব বোসবাবু যেন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন।

এদিকে জীবনলাল, বোসবাবুর সহিত তাহার দেখা করাইয়া দিবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম যে, বোসবাবু কোন অপরিচিত

লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। অনেক কষ্টে আমি তাঁহাকে তোমার সহিত দেখা করিতে সম্মত করাইয়াছি। কথাটা শুনিয়া জীবনলাল অত্যন্ত উৎসাহিত হইল। বোসবাবুকে দিবার জন্য কিছু ফল সে কিনিল এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার সঙ্গে আসিল। সাক্ষাৎকারের পর বোসবাবুর ধারণা হইল যে, লোকটা একটি নিরেট বোকা।

এখন হইতে জীবনলাল অধিকাংশ সময়ই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সকল কথাই সে জানিতে চাহিত। কিন্তু তাহাকে কোন কাজের কথা বলিতে গেলেই সে তাহা যথাসাধ্য এড়াইতে চেষ্টা করিত। বোসবাবু এবং রহমৎ খাঁর সঙ্গে বাজারে চলাফেরা করিতেও সে ভয় পাইত। কিন্তু যখনই সেনোরা কারোনি আমার দোকানে আসিতেন, তখনই তাঁহার নিকট বড় বড় কথা বলিত এবং তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে যে, সেও আমাদের দলের মধ্যে আছে।

[আফগান সরকার আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া নির্ব্বাসিত করার পর, কাবুলের লোকেরা তাহাকে ভয় দেখাইয়া একেবারে দিশাহারা করিয়া তুলিল। তাহারা তাহাকে বুঝাইল যে, সে যখন আমার বন্ধু তখন আফগান সরকার হয়ত তাহাকেও তাড়াইয়া দিবে। আমার ভারতবর্ষে পৌঁছিবার আট দিন পর সেও ভারতে ফিরিয়া আসিল। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় পুরিয়া দিল।]

বোসবাবুর জন্য আমাদের দুই প্রস্থ পোষাক তৈয়ারীর প্রয়োজন হইল। আমি বাজার হইতে কয়েক রকম কাপড়ের নমুনা 'লইয়া আসিলাম। বোসবাবু দুইটি নমুনা পছন্দ করিলেন। হাজি সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এক দর্জ্জির সহিত তাঁহার খুব খাতির আছে। সে তাঁহার সমস্ত পোষাক তৈয়ারী করে। তিনি আমাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, বোসবাবুকে যেন তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে তিনি দর্জ্জিকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। দর্জ্জি বোসবাবুর পোষাকের মাপজোখ লইবে। বোসবাবুর রওয়ানা হইবার তারিখের আগেই যে ঐ দর্জ্জি পোষাক তৈয়ারী করিয়া দিতে পারিবে সে সম্পর্কে হাজি সাহেব নিশ্চিন্ত ছিলেন। বোসবাবু এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

পরদিন বোসবাবু আমার সঙ্গে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। বেলা একটা পর্য্যন্ত বাজারে ঘোরাফেরা করিলেন। তাহার পর হাজি সাহেবর বাড়ীতে যাইলেন। দর্জ্জিকে সেখানে ডাকাইয়া আনা হইল। দর্জ্জি মাফজোখ লইয়া গেল। যদিও ঠিক সময়েই সে পোষাক তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা ওয়েষ্টকোট আর দিতে পারিল না। হাজি সাহেবের স্ত্রী বলিলেন যে, উহা তৈয়ারী হওয়ার পর তিনি উহা তাঁহার জার্ম্মাণীস্থ এক ভগিনীর সাহায্যে ডাকযোগে পার্শেল করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। তিনি তাহা করিয়াছিলেন।

পরের দুই দিন পথিমধ্যে বোসবাবুর যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হইবে আমরা তাহা কেনাকাটা করিলাম।

শেষ চিঠি

পরের দিন রহমৎ খাঁ বোসবাবুর একখানি চিঠি ইতালীয় দূতাবাসে দিয়া আসিলেন। তাহার পর ইতালীয় দূত এবং তাঁহার স্ত্রী আমার দোকানে আসিলেন। সেনোরা কারোনি, আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিলেন যে, বোসবাবুর জন্য ইহাই তাঁহাদের শেষ চিঠি।

এই চিঠিতে বোসবাবুকে তাঁহার সমস্ত জিনিষপত্র একটি সুটকেসে ভরিয়া আমার দোকানে পাঠাইয়া দিতে বলা হইয়াছিল। চিঠিতে আরও বলা হইয়াছিল যে, ১৬ই মার্চ্চ বিকাল দুইটার সময় একজন লোক আসিয়া উহা লইয়া যাইবে। বোসবাবুকে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে এখান হইতে রওয়ানা হইতে হইবে।

চিঠির শেষে বলা হইয়াছিল—আপনাদের দুইজনকেই নূতন সহরস্থ ইতালীয় দূতাবাসের সেনোরা কারোনির বাড়ীতে ১৬ই মার্চ্চ রাত্রি আটার সময় উপস্থিত হইতে হইবে। আপনারা সেখানে আহার করিবেন। যাওয়া সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত বিবরণ সেখানেই জানান হইবে।

যখন চিঠিখানি আমার হস্তগত হইল তখন বোসবাবু হাজি সাহেবের বাড়ীতে ছিলেন। আমি চিঠিখানি লইয়া

তাঁহার নিকটে যাইলাম এবং বলিলাম, আগে আমাকে কিছু খাওয়ান তবে আমি চিঠিখানি দিব।

বোসবাবু বলিলেন—দুঃখের বিষয়, আপনাকে খাওয়াইবার মত বিশেষ কিছুই নাই; সামান্য একটু কেক্ দিতে পারি মাত্র।

তিনি আমাকে এক টুকরা কেক্ দিয়া বলিলেন—এখন খবরটা কি বলুন?

আপনি এতকাল যে সংবাদের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সে প্রতীক্ষার দিন শেষ হইয়াছে—এই কথা বলিয়া বোসবাবুর হাতে আমি চিঠিখানি দিলাম।

পত্রখানি গভীর মনোযোগের সহিত আদ্যান্ত পাঠ করিয়া বোসবাবু বলিলেন—আমি এই সংবাদটি পাইয়া অত্যন্ত খুশী হইলাম।

তাহার পর, আমি তাঁহার জন্য যাহা করিয়াছি, তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি আমাকে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলাম—আমার দ্বারা যদি তাঁহার কোনপ্রকার অসুবিধা হইয়া থাকে, বা আমরা অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রতি যদি কোন অশ্রদ্ধার কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি যেন আমাদিগকে ক্ষমা করেন।

কথাটা শুনিয়া বোসবাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং সহাস্যে বলিলেন,—হ্যাঁ, রাগ আছে, তবে আপনার উপর নয়,—

আপনার ঐ ছোট মেয়েটির উপর। আমি যখনই খাইতে বসিতাম তখনই সে আমার পাতে রুটির পর রুটি চাপাইয়া যাইত। যেখানে দুইখানা রুটি খাইব মনে করিতাম, সেখানে সে আমাকে পাঁচখানা রুটি খাওয়াইয়া ছাড়িত।

সেদিন, হাজি সাহেবের বাড়ী হইতে সন্ধ্যার অনেক পরে আমরা বাড়ী ফিরিলাম। হাজি সাহেবের বাড়ী হইতে আসার সময় তিনি বোসবাবুকে আবার ১৭ই তারিখে তাঁহার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের এবং চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলেন। বোসবাবু হাসিমুখেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

পরদিন ১৬ই মার্চ্চ। আমরা বোসবাবুর জিনিষপত্র একটা সুটকেসে ভরিলাম, এবং দোকানে আসিবার সময় সুটকেসটা আমার সঙ্গে লইয়া আসিলাম। শেষ-পত্রে সেনোরা কারোনির বাড়ীর ঠিকানা দেওয়াই ছিল, সুতরাং বাড়ীটি খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইল না।

উক্ত সপ্তাহে 'এম' দুই দুইবার আমার কাছে আসিয়া খোঁজ করিল যে, যে বন্ধুটির আসিবার কথা ছিল তিনি আসিয়াছেন কিনা? আমি বলিলাম—না, তিনি অসেন নাই। তাহার পরও যখন সে আবার খোঁজ করিতে আসিল, তখন আমি বাধ্য হইয়া বলিলাম, আমার বন্ধু অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় আসিতে পারেন নাই। রহমৎ খাঁও ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছেন। কাজেই রুশ সীমান্তে যাইবার ব্যবস্থা উপস্থিত ছাড়িয়া দিতে হইল। এইবার

আমি টাকার কথা তুলিলাম এবং তাহাকে বলিলাম—তোমাকে আমি চার শত টাকা দিয়াছি, তাহা হইতে তুমি একজোড়া চপ্পল এবং একটা লুঙ্গি কিনিয়াছ; উপস্থিত বাকী টাকাটা তাহা হইলে আমাকে ফেরত দাও।

জানিতাম যে, ঐ টাকা ফেরত পাওয়ার আর কোন আশা নাই। একটা পুরাতন কথা আছে—বন্ধুকে যদি বিদায় দিতে চাও তবে তাহাকে টাকা কর্জ্জ দাও। আমি বন্ধুকে বিদায় দিতেই চাহিয়াছিলাম।

বৈকাল ঠিক দুইটার সময় সেনোরা কারোনি আসিয়া সুটকেসটি চাহিলেন। আমি উহা তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই বোসবাবুর আমার বাড়ীতে অবস্থানের শেষ দিন।

পরদিন প্রাতরাশের পর বোসবাবু আমার ছেলেমেয়েদের স্নেহ-চুম্বন দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং বেলা এগারোটার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সেদিনটা তিনি হাজি সাহেবের বাড়ীতেই কাটাইলেন।

হাজি সাহেবের বাড়ী হইতে সেনোরা কারোনির বাড়ী আসার পথে তাঁহার টুপিটি আমাকে দিয়া তিনি আমার কারাকালি টুপিটি লইলেন। যাহাতে তাঁহার উপর লোকের অকারণ নজর না পড়ে সেই জন্যই তিনি উহা করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। বোসবাবু

আমাকে শেষ কথা বলিলেন—খুব সাবধানে থাকিবেন। আমি বার্লিনে পৌঁছিয়াই আপনাকে সব কথা জানাইব।

পরদিন সকাল প্রায় দশটার সময় রহমৎ খাঁ আমার দোকানে আসিয়া বলিলেন যে, বোসবাবু নয়টার সময় রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। দুইজন জার্মাণ এবং একজন ইতালীয়ান তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। ইতালীয়রা বোসবাবুকে যে ছাড়পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে বোসবাবুর নাম দেওয়া হইয়াছিল, 'তারাতাইন'।

বোসবাবুর সঙ্গে যে দুইজন জার্মাণ গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ডাঃ ওয়েলার। হাজি সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিনি অত্যন্ত চালাক লোক। জার্মাণরা বোসবাবুকে ইতালীয়দের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া নিজেদের হাতে রাখিবে এই মতলবেই বোধ হয় ডাঃ ওয়েলারকে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। জার্মাণ এবং ইতালীয়রা একপক্ষেই ছিল বটে, কিন্তু তাহারা মনে মনে পরস্পরকে ঘৃণা করিত। বোসবাবু কাবুল পরিত্যাগ করিলে পর জার্মাণরা তাঁহার সম্বন্ধে ইতালীয়দের সম্পর্ক একেবারে বাদ দিয়া দেয়, এবং একমাত্র জার্মাণদের সহিতই এ সম্বন্ধে আমাদিগকে সম্পর্ক রাখিতে বলে।

মস্কো হইতে বার্লিন

ডাঃ ওয়েলার বোসবাবুকে সোজা বার্লিনে লইয়া যান। আমি পরে সেনোরা কারোনির নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, প্রথমে সকলকেই মালপত্রসহ একটি গাড়ীতে করিয়া রুশ সীমান্তে লইয়া যাওয়া হয়। রাত্রিতে তাঁহারা কাবুল ও রুশ সীমান্তের মধ্যবর্ত্তী পুল খুংরীতে অবস্থান করেন। সমগ্র আফগানিস্থানে একটিমাত্র কাপড়ের কল আছে এবং সেই কলটি ঐস্থানে অবস্থিত। পরদিন তাঁহারা আফগান সীমান্ত পার হইয়া রুশভূমিতে পদার্পণ করেন, এবং ২০শে মার্চ্চ তারিখে বোসবাবু ট্রেনযোগে মস্কো চলিয়া যান। রহমৎ খাঁও সেই দিন কাবুল ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হন।

কয়েকদিন পরে জার্ম্মাণ দূতাবাসে বার্লিন হইতে একখানি সাময়িক পত্রিকা আসে। উক্ত পত্রিকাতে বোসবাবুর বার্লিন পৌঁছিবার সংবাদ পাওয়া যায়। জার্ম্মাণ দূতাবাস হইতে হাজি সাহেবের মারফৎ উহা আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পত্রিকাখানির এক পৃষ্ঠায় বোসবাবুর একখানি চিত্র ছিল, এবং তাহার নীচে তাঁহার বার্লিন উপস্থিতির সংবাদ মুদ্রিত ছিল। হাজি সাহেবের স্ত্রী উহা অনুবাদ করিয়া আমাকে শোনান। সংবাদটি হচ্ছে এই :—ভারতের প্রতিপত্তিশালী নেতা এবং ভারতের জাতীয় মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু—কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি ভারতবর্ষ হইতে

রহস্যজনক ভাবে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন—২৮শে মার্চ্চ তারিখে নির্ব্বিঘ্নে বার্লিনে পৌঁছিয়াছেন।

সেনোরা কারোনি কয়েকদিন পর আমার দোকানে আসেন। তিনি বলেন যে, বোসবাবু একখানা মোটরে করিয়া রাশিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত যান এবং সেখান হইতে ট্রেনে করিয়া মস্কো যান। ২৭শে মার্চ্চ তিনি মস্কো পৌঁছান। তাঁহাকে বার্লিন লইয়া যাইবার জন্য সেইখানে একখানা বিমান অপেক্ষা করিতেছিল। ২৭শে মার্চ্চ রাত্রিতে মস্কোয় অবস্থান করিয়া, পরদিন সকালে তিনি উক্ত বিমানযোগে বার্লিন রওয়ানা হইয়া যান। তিনি রোম যান নাই, তবে বার্লিন হইতে রোম যাইতে পারেন।

গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা

বোসবাবু কাবুল ত্যাগ করিবার কয়েক দিন পর বাজারে একটি লোকের সহিত আমার দেখা হয়। তিনি ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের লোক বলিয়া জানা ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন, আপনার সহিত আমার একটা জরুরী কাজ আছে—আপনার দোকানেই যাইতেছিলাম, দেখা হইয়া ভালই হইল। কথাটা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার সহিত এই লোকটার কি কাজ থাকিতে পারে, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। তিনি আফগান রাজসভার একজন সভাসদ। বসি সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপারটা কি, এবং আমি আপনার কি কাজে লাগিতে পারি খুলিয়াই বলুন ?

বসি সাহেব বলিলেন—ব্যাপারটা জরুরী হইলেও তেমন জরুরী নয়। তবে কিনা আপনি ব্যতীত এ কাজটা আর কেহ করিতে পারিবে না। আরও দুইজন ভারতীয়কে কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা কেহই কোন সাহায্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারাই আপনার নাম করিলেন।

আমি তাঁহাকে ঐ দুইজন ভারতীয়ের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম এবং আমাকে কি করিতে হইবে তাহা জানিতে চাহিলাম।

বসি সাহেব বলিলেন—তাঁহাদের নাম জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিষয়টা এই : আপনি বোধ হয় জানেন জার্ম্মাণীতে আফগানিস্থানের একজন রাজদূত আছেন, তাঁহার নাম খান আল্লা নওয়াজ খান। তিনি আমার বন্ধু। হুজুর আমীরের সহিত প্রতি সোমবার তিনি বার্লিন হইতে টেলিফোনে কথাবার্ত্তা চালাইয়া থাকেন।

আমি উত্তর করিলাম—খান আল্লা নওয়াজ খান যে বার্লিনের আফগান রাজদূত সে কথা জানি। তবে তিনি যে টেলিফোনযোগে হুজুর আমীরের সহিত প্রতি সোমবার কথাবার্ত্তা চালাইয়া থাকেন তাহা আমি কি করিয়া জানিব ?

বসি সাহেব বলিলেন—আপনি হয়তো না জানিতে পারেন, কিন্তু কাবুলের আর সকলেই তাহা জানে। গত সোমবার

দিন তিনি আমার সহিত টেলিফোনযোগে কথা বলিয়াছেন। তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, দুইজন হিন্দু ভারতবর্ষ হইতে পলাইয়া আসিয়া কাবুলে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা নাকি হিন্দুপাড়ায় একজন হিন্দুর বাড়ীতে আছেন। এবং কাবুলস্থ জার্ম্মাণ-দূত তাঁহাদিগকে বার্লিনে পাঠাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কোথায় আছেন তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন এবং সোমবারের মধ্যে আমাকে জানাইবেন।

আমি—পলাতক হিন্দুদ্বয়ের নামও খান সাহেব নিশ্চয়ই আপনাকে জানাইয়াছেন।

বসি সাহেব—হ্যাঁ জানাইয়াছেন। নোটবুকে তাঁহাদের নাম লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, উহা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছি। উহাদের মধ্যে একজনের নাম বোধ হয় চন্দ্র বোস।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সুভাষচন্দ্র বোস নয় তো?

বসি সাহেব—হ্যাঁ, হ্যাঁ উহাই বটে! বলিয়া সচকিত হইলেন।

আমি—শুনিয়াছি তিনি ভারতের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং বাঙ্গালা দেশের লোক। দুই মাস পূর্ব্বে তিনি রহস্যজনকভাবে অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন তাহাও শুনিয়াছি। তবে আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে কোথাও যেন একটা ভুল হইয়াছে। একজন বাঙ্গালী, তাহার উপর একজন মস্ত বড় নেতা, কি ভাবে ভারতবর্ষ হইতে পলাইয়া আসিয়া এ

দেশের ভাষা না জানিয়া এখানে থাকিতে পারেন বুঝিতে পারিতেছি না? যে লোকটা টেলিফোনে আপনাকে ঐ কথা বলিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পাগল হইবেন।

বসি সাহেব একটু উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিলেন—ও সব আমি কিছু জানি না। টেলিফোনে আফগান-দূত আমাকে যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলিলাম। খবরটা যদি আনিয়া দিতে পারেন তবে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

আমি তর্ক তুলিয়া বলিলাম—কিন্তু বসি সাহেব, আমার সাধারণ বুদ্ধি তো বলে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পলাতকদ্বয় কাহার সহিত বাস করিতেছে তাহা আপনি আমাকে বলেন নাই। তিনি আফগানিস্থানের লোক না বিদেশী তাহাও আমাকে জানিবার সুযোগ দেন নাই—এত দূরে থাকিয়া আল্লা নওয়াজ খান যদি সব কথাই জানেন, তবে যাহার বাড়ীতে পলাতকদ্বয় অবস্থান করিতেছে, সেই হিন্দুর নামটিও তিনি বলিতে পারিতেন।

বসি সাহেব—তিনি নামটা আমাকে বলেন নাই। তবে নামটা খুঁজিয়া বাহির করা বিশেষ কষ্টকর নয়, বিশেষ করিয়া তিনি যদি হিন্দুপাড়ায় বাস করিয়া থাকেন।

আমি বলিলাম—জানেন, আমি এদেশের লোক নই। সকালে দোকানে আসি বিকালে বাড়ী চলিয়া যাই। ব্যবসা ছাড়া কাবুলে আর কোনকিছুর খোঁজ-খবর বিশেষ রাখি না। কাহার বাড়ীতে তাঁহারা লুকাইয়া আছেন তাহা আমি

কেমন করিয়া বাহির করিব? আমি সব সময় রাজনীতি হইতে দূরে থাকি। আপনি বরং এই কাজটার ভার অন্য কোন কাবুলীর উপর দিন। তিনি হয়তো আপনাকে কোন সন্ধান দিতে পারিবেন। তবে আমার একটা কাজ করিয়া দিবার জন্য আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। যদি আপনি কোন দিন সুভাষচন্দ্র বসুর খোঁজ পান, তাহা হইলে আমাকে একবার সংবাদ দিবেন, আমি একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিবে।

বসি সাহেব আবার বলিলেন—আপনি যদি তাঁহার সন্ধান না করিতে পারেন তাহা হইলে কাবুলে আর কেহই পারিবে না। অন্ততঃ আমার তো মনে হয় না যে, আর কেহ পারিবে। আপনি চাহিতেছেন তাঁহার দর্শন; আর আমি যে কি করিয়া তাঁহার সন্ধান করিব তাহাই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

বসি সাহেবের আসল মতলবটা কি তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতেই বুঝিয়া লইয়াছিলাম। আল্লা নওয়াজ খান তাঁহার সহিত টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার মনগড়া কথা। আফগানিস্থানে তিনিই একমাত্র গোয়েন্দা নয় যে, রাজদূত তাঁহার সহিতই টেলিফোনযোগে কথাবার্ত্তা বলিবেন। আর বার্লিনের পররাষ্ট্র বিভাগের লোকগুলিও এমন নির্ব্বোধ নয় যে, সুভাষবাবুর কাবুল অবস্থানের গোপন কথাটা এত সহজেই ফাঁস্ করিয়া দিবেন। নিশ্চয়ই

অপর কোন লোক বসি সাহেবকে এই কাজের ভার দিয়াছে। আমি বসি সাহেবকে স্পষ্টতঃ এই কাজের ভার লইতে পারিব না বলিয়া চলিয়া আসিলাম। সমস্ত ঘটনাটা বিচার করিয়া বুঝিলাম, ভারত সরকার খবর পাইয়াছেন যে, বোসবাবু কাবুলে আছেন। কিন্তু ঠিক সময়ে খবর পান নাই ভাবিয়া মনে মনে খুসীই হইলাম।

পরদিন বাজারে আবার বসি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বোসবাবুর সহিত আর একজন যিনি আসিয়াছেন, বসি সাহেব তাঁহার নাম করিলেন। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, ভারত সরকার বোসবাবুর সঙ্গীর নাম জানেন না। কিন্তু বসি সাহেব যখন যথাযথ নামটা বলিলেন, তখন আমার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলাম—আচ্ছা খোঁজ করিয়া দেখিব, এবং যদি বাহির করিতে পারি তাহা হইলে আপনাকে জানাইব। ইত্যবসরে আপনি আমার জন্য একটা কাজ করিবেন। যদি আবার খান আল্লা নাওয়াজ খানের সহিত আপনার টেলিফোনে কথাবার্ত্তা হয়, তাহা হইলে পলাতকদ্বয় যে হিন্দুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার নাম তিনি জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। এই বলিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম।

আমার মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র বিভাগই কি গোপন কথাটা প্রকাশ করিয়া

দিয়াছেন? তাহাই যদি হইবে তবে সুভাষবাবু কাবুলে কাহার বাড়ীতে আছেন, তাহা জানিতে পারা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইত না। সুভাষবাবুর পলায়নের পর ভারতীয় পুলিশ নিশ্চয়ই যাহারা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে, তাহাদের বাড়ী তল্লাস করিত। এবং রহমৎ খাঁরও খোঁজ না পাইয়া সন্দেহ করিত যে তিনিও সুভাষবাবুর সহিত পলায়ন করিয়াছেন।

কয়েকদিন পর সেনোরা কারোনি আমার দোকানে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন জার্ম্মাণ ভদ্রলোক ছিলেন। সেনোরা কারোনি তাঁহাকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তিনি জার্ম্মাণ দূতাবাসের একজন কর্ম্মচারী, সম্প্রতি কাবুলে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া অভিযোগ জানাইলাম যে, বার্লিনের পররাষ্ট্র বিভাগ আমাদের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বসি সাহেবের কাছে আল্লা নওয়াজ খান টেলিফোনে যাহা বলিয়াছে তাহাও বলিলাম। কথাটা শুনিয়া প্রথমেই তিনি হাসিয়া উঠিলেন, পরে উত্তরে বলিলেন—আমাদের পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে এইরূপ কোন কথাই বাহিরে যাইবার উপায় নাই। তাহার পর সকলকে বাদ দিয়া কিনা আফগান-দূতই পাইবে এই গোপন খবর! আরে ছিঃ!

সেনোরা কারোনি বলিলেন যে, হয়তো পেশোয়ারের গোয়েন্দারা রহমৎ খাঁর খোঁজ করিয়াছে এবং তাঁহাকে

না পাইয়া ধরিয়া লইয়াছে যে, তিনিও সুভাষবাবুর সহি অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

আমি বলিলাম—আমারও তাহাই মনে হয়। এই বেকুবগুলির কথা একবার ভাবুন। তাহারা আর লো না পাইয়া আমাকেই কিনা শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া জিজ্ঞাস করিল সুভাষবাবুর কথা। সেনোরা কারোনি ও জার্ম্মা ভদ্রলোক হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহার পর আমার সহি করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেলেন।

বোসবাবু কাবুল ত্যাগ করিবার তিন মাস পরে হা সাহেবের স্ত্রী তাঁহার নিকট হইতে জার্ম্মাণ ভাষায় একখান পত্র পান। সেই পত্রে বার্লিনে হাজি সাহেবের যে ভগ্নী ছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা ছিল। উক্ত পত্রে বোসবা তাঁহার ওয়েষ্টকোটটির প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। আমা সম্বন্ধেও উক্ত পত্রে দুইটি লাইন ছিল। হাজি সাহেবের স্ত্রী উহা অনুবাদ করিয়া আমাকে শুনাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল—

উত্তমচাঁদ, নমস্তে। আপনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। জীবনে আমি আপনার উপকার ভুলিব না। ইতি—

জিয়াউদ্দীন

সমাপ্ত